এ পৃথিবীতে সন্দিগ্ধ-মনার অভাব নাই, তাহারা বারম্বার প্রশ্ন করে কে আছে, কে আমাদিগের মঙ্গলবিধান করিবে। হে রহস্য-মধুর প্রেমময়, মায়া-যবনিকা অপসারিত করিয়া একবার কল্যাণ মূর্ত্তি প্রকাশিত কর—একবার তোমার প্রসন্ন মুখের দিব্য দীপ্তিতে ত্রিভুবন উজ্জ্বল হইয়া উঠুক!

হৃদয়ে আমার আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে, ধান্য ক্ষেত্রে কনক ধান্যশীর্ষে যে আনন্দ স্পন্দিত হয়, পরিণত দ্রাক্ষাগুচ্ছে যে সুমধুর রসধারা সঞ্চিত থাকে, কিছুরি সহিত আমার চিত্তের ভূমানন্দের তুলনা হয় না।

নিঃশব্দে নয়ন মুদ্রিত করিয়া আমি শান্তিতে নিমগ্ন থাকিব—নিদ্রার পরিপূর্ণ বিরাম উপভোগ করিব—তোমার স্নেহনত নেত্র যখন আমার প্রহরী, তখন আর আতঙ্ক কোথায়?

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

যোগীবেশ।

দুঃখ সুখের ওপারটিতে বাঁধব আমি ঘর
সেথায় গিয়ে তোমার সাথে মিলব:যোগীবর।
আমার মনের এই আশাটি বিফল হবার নয়
যতই কঠিন হোক্ না কেন দুঃখ সুখের জয়।
সকল ত্যাগী, তোমার লাগি দুঃখের ভাগী হব,
এই কথাটি মনে আমার রয় যদি গো ধ্রুব,
তবেই আমার মনের আশা বিফল হবার নয়,
যতই কঠিন হোক্ না কেন দুঃখ সুখের জয়।
তুমি যোগী তোমার মনে নাইক কোন আশা
তাইতে সেথা দুঃখ সুখে বাঁধতে নারে বাসা,
তোমার মনের সঙ্গে আমার মনটি করি লয়
অনায়াসে করব আমি দুঃখ সুখে জয়।
তোমার সাথে মনটি আমার ধরবে যোগীবেশ
সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি দুখের পর্ব্ব শেষ।
ওহে যোগী তোমায় মানি—শুধু তোমায় চাই
দুঃখ সুখের বালাই আমার তির সীমানায় নাই।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বিলাতের চিঠি।

L. Hampton Sussex.

সু—

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি আর বারে বিশেষ কিছু লিখতে পারিনি আর তোমাকে একটা লম্বা চিঠি দেব বলে রেখেছিলাম তাই আজকে আবার লিখ্তে বসিছি। আর কিই বা লিখব। সমুদ্র আছে আর আমরা আছি। কি রকম লাগে সে তোমরা আন্দাজ করলেই পার। আর বইটইতেও তো পড়েছ। তাই বলছি যে আর বিশেষ কিছু লিখবার নাই। তবে দেখা যাক যদি লিখতে লিখতে কিছু পাওয়া যায়।

আগের চিঠিতে জেনেছ যে আমাদের বাড়ী একেবারে সমুদ্রের তীরে। মাঝে খুব ছোট একটা মাঠ আছে। এখানে প্রত্যেক গ্রামে কিম্বা সহরে এক একটা বিশেষ মাঠ আছে। সেগুলোকে common বলে। (House of commons নয় কিন্তু।) এই সমস্ত common গুলোর উপরে খেলা কিম্বা গাধার Race হয়। Dickens এর বইতে খুব সম্ভব এই রকম Raceএর কথা পড়েছ।

আমাদের commonএর সামনেই বাড়ী তাই মাঝে মাঝে Donkey race বসে বসে দেখি। কতগুলো টাট্টু ঘোড়া আর গাধা সমস্ত দিন বাঁধা থাকে। আর ছয় আনা দিলেই তোমাকে চড়িয়ে একবার মাঠের এদিক ওদিক করে আনবে। অবিশ্যি এই সব খেলা ছেলে-পিলেদের জন্য। আমাদের জন্য আজকাল এখানে বিশেষ কিছুই নাই। মাঝে ঘোড়া চড়বার বড় সখ হয়েছিলো। আমার এক ডাক্তার বন্ধুকে ত প্রথম দিন চড়িয়ে দিলাম। সে ভদ্রলোক যে খুব ভালো ঘোড়া চড়তে পারেন তা নয়। তাই খুব এক sensation হয়ে গেল। সহরের মধ্যে ঘোড়ার জোরে দৌড়াবার আওয়াজে সকলে বাইরে এসে তামাসা দেখতে আরম্ভ করল। আমার বন্ধুটির যদিও কার্ত্তিকের মত চেহারা তবুও ঘোড়ার উপর থাকবার সময় জগন্নাথজীর মত দেখাচ্ছিলো। সমস্ত সহরের লোক বেরিয়ে তামাসা দেখলো—কালো মূর্ত্তি কালো ঘোড়ার উপর দেখে আর তার ভাবগতিক দেখে খুব হাসির রোল পড়ে গেল।:বন্ধুটি একবার পড়েছিলেন। আমার বন্ধুটি যেখানে যেতে চান্ ঘোড়া সেখানে যায় না অথচ ঘোড়া যে দিকে যায় সে দিকেই বন্ধুকে যেতে হয়। অনেকটা John Gilpinএর মত অবস্থা হয়েছিল। যাক তার পর থেকে আমার ঘোড়া চড়ার উৎসাহ Below zero হয়ে গেলো। বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলে বলে যে পায়ে ব্যথা হয়েছিলো তাই আর চড়ছি না, তা না হলে আজকেও যেতাম। কিন্তু আমার

মনে হয় পায়ে ব্যথা ছাড়া ঘোড়া না চড়বার অন্য কারণও আছে।

যাকগে। পরশুদিন Arundel castle দেখতে গিয়েছিলেম। এখান থেকে মাইল দশেক। রেলে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগে। আমরা প্রায় তিনটের সময় রওনা হয়েছিলাম। দিনটি বেশ ছিল। ন শীতো নাশিচ উষ্ণ গোচের আর মৃদু মৃদু হাওয়া বইতেছিল। খুব চমৎকার দিন। এখানে এসে অনেক দিন এই রকম weather পাইনি। আর সত্যি এখানকার weather এমন যে একটু রোদ কিম্বা একটু সুন্দর দিন হলে মন ভারী উৎফুল্ল হয়ে উঠে। আমাদের দেশে weather এর উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়ে না। weather খারাপ কিম্বা ভালো সে দিকে মন যায় না কিন্তু এখানে weather অনেকটা মানুষের মনের উপর কাজ করে। এর জন্যে সুখ দুঃখের অনেক এদিক ওদিক ঘটে। আর একটা জিনিষ দেখি যে এদের সাধারণ লোকে অল্পেতেই সুখী হয় আবার অল্পেই দুঃখী হয়। কোথায় জানি না পড়েছিলাম "A little consoles us because a little distresses us." এদের দেশে এই littleএর মধ্যে weatherকে ধরা যেতে পারে। এটা consoleও করে আবার distressও করে। দেখ দেখি কোত্থেকে কোথায় এসে পড়লাম। বলছিলাম Arundel castleএর কথা আর এনে ফেল্লাম সুখ ও দুঃখ। দর্শন পড়ার ফল ফলছে বোধ হয়।

যাক আমরা তো নিরাপদে Castleএ গিয়ে পৌঁছিলাম। প্রথম দ্রষ্টব্য দূর থেকে Castle। তোমরা অনেক ছবি দেখেছ Castle এর আর এদের দেশে একটি Castle ঠিক একেবারে অন্যটির মত। বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। এটা আমি বাইরে থেকে বলছি কারণ ভিতরে যাবার সুবিধা ঘটে উঠেনি। এক বৎসরের মধ্যে একদিন কেবল Castleএর মধ্যে যেতে পারা যায়। Castle বল্লেই মনে হয় পুরোনো ধ্বংসাবশেষ কিন্তু এটি ঠিক সে রকম নয়। লোকজন থাকে আজকালও। তাই যখন তখন ঢুকতে দেয় না।

তার পরেই দ্রষ্টব্য এক Cathedral, এটা খুব বড় এবং লম্বা চওড়া। খুব পুরোনো কালের Cathedral বলে মনে হয় না। এর খরচ নাকি Duke of Norfolk সমস্ত meet করেন। এইটি দেখতে দেখতে আমার মনে আর একটা ছবি উঠেছিলো। আমরা একদিন Bandel Church দেখতে গিয়েছিলাম। সে Church এর সঙ্গে অনেক Associations মাখা ছিলো তাই খুব গভীর ভাবে Enjoy করেছিলাম। আর এইখানকার গির্জ্জার কোনও Tradition কিম্বা association কিছুই জানি না—তেমন Enjoy করতে পারলাম না কেবল মানুষের ভক্তি এবং শ্রদ্ধার কতগুলো আভাস পেয়ে আসলাম। আমরা এক যুবককে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম। সে Roman Catholics দের কিছুই জানে না তাই কিছুই বলতে পারলো না। আমার মনে হয় আমাদের আজকালকার লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে এই Catholic Religionএর খুবই সামঞ্জস্য আছে। দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে বেশ একটি দৃশ্য ভেসে উঠলো। সন্ধ্যাবেলা-গ্রাম-শিবমন্দির-কাঁসর ঘণ্টা—শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি। সত্যি এই সব জিনিষ আমাদের হাড়ে হাড়ে বসে গেছে। এইগুলোর সঙ্গে কত ভক্তি কত শ্রদ্ধা আর কত সুখ দুঃখ মাখান আছে। এগুলো আমার খুব ভালো লাগে। তাই এই সমস্ত ভাব তখন মনে হচ্ছিলো।

Castle এর একদিক দিয়ে এক উঁচু পাহাড় উঠেছে, তার পরেই একেবারে পায়ের কাছে একটি আঁকা বাঁকা হ্রদ। জল খুব স্বচ্ছ এবং সুন্দর আর বেশ ঘুরে ফিরে পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বেঁকে গিয়েছে। জলের ভিতরে ছোট ছোট গাছ পালা খুব সবুজ—এমন সুন্দর রঙ ছড়িয়েছিল! তার উপর আবার খুব শাদা পাখাওয়ালা রাজ হংস! বিষ্ণু পুরাণে সৌভরি মুনির আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা নির্ম্মিত সেই রাজকুমারীদের প্রাসাদের সঙ্গে সঙ্গে যে রকম সরোবর ছিল সে গুলোর মত। বাস্‌রে কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমাস আমাদের ভাঙতে হোতো! একটার নমুনা দিই। "কূজতকলহংস কারণ্ডবাদিবিহঙ্গমাঃ" ইত্যাদি।

যে সমস্ত পাহাড়ের কথা বলিছি প্রায় সব গুলোই chalk এর তৈরি। কিন্তু আশ্চর্য্য উপরে খুব সবুজ ঘাস ও ফসল আছে। আর সেই পাহাড় গুলোর মধ্যেই খরগোস ময়ূর বন্যকুক্কুট ইত্যাদি অনেক জন্তু আছে। আর হরিণ আছে অনেক। এক কথায় বেশ লাগছিলো। তার পরেই এক পাহাড়ের গায়ে এক Inn। এটাকে Black Rabbit বলে এবং এটা অনেক পুরোনো Inn। এটাকে ঠিক সেই পুরোনো ধাঁচেই রেখে দিয়েছে। আমাদের দেশের সরাইয়ের মতই। Scott এর Novelএ এই সব Inn এর কথা অনেক আছে। লোকজন কেউ বেশী ছিল না। আমরা তিনজন বসে চা খেলাম। বাস্‌রে বাস! কি চা দিয়েছিলো! "বিনাপয়সার ভোজের" সেই মৃদু মধুর তামাকের কথা মনে পড়ে। ভোলানাথ সম্বন্ধীয় সেই উক্তিটা আমাদের ঘাড়ে পড়ে আর কি! বিনা পয়সা দিয়ে সেই রকম কড়া তামাক খাওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নাও হতে পারে কিন্তু বেশী দাম দিয়ে সেই রকম

কড়া চা খেতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিলো। যাক তখন Scott এর সমস্ত Heroর কথা কল্পনা করতে করতে তিন কাপ চা খেয়েই ফেল্লাম। আবার মুস্কিল হয়েছিলো এই যে আমি কায়দা করে চায়ের সঙ্গে দুধ খাওয়া এখানে এসে অবধি ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখন কড়া চা নিয়ে শুধু কড়াত্বের দোহাই দিয়ে দুধও খেতে পারি না—মহা মুস্কিল আর কি। আর—সে দৃশ্য এখনও মনে আনতে আরাম লাগছে। সামনেই এক ছোট নদী। আমার বন্ধু বল্লেন যে "চল আমরা গাছের নীচে বসে চা খাই"—আমি বল্লাম "না, নদীর ধারে বসে খাওয়া যাক।" শেষে আমরা নদীর ধারে এক গাছের নীচে বসে চা খেলাম। সামনে নদী (এটা হচ্ছে England এর মধ্যে বেশ একটু বেগবতী—ঘণ্টায় 12 miles যায়) আর পেছনে পাহাড়। আর দুই ধারে গাছপালা। দূরে castle দেখা যাচ্ছে। কাছেই Black Rabbit। আমার বন্ধুকে বল্লাম "I think it would have been more interesting to have lived in the olden times" তার পর Tennyson এর কয়েকটা line মনে মনে আওড়ালাম।

"Blight and famine, plague and earthquake,
roaring deeps and fiery sands
Clanging fights, and flaming towns,
and sinking ships and praying hands."

কিন্তু আমার বন্ধুর এ সব আসে না। সে কেবল বল্ল "Yes"।

আজকে আর হচ্চে না, কালীমোহন বাবুরা না কি আজকে আসচেন কিন্তু আমার মনে হচ্চে April fool করছেন। হিসাবে বোধ হয় ভুল হয়ে গেছে। আজকে 2nd April, কালকে করলে পারতেন। এখন বেশ রোদ উঠেছে। স্নান করতে যাব এখন। চারটে বাজে যে। কেমন আছ জানাবে।

২রা এপ্রিল। শ্রীনারায়ণ কাশীনাথ দেবল।

শেষযাত্রা।

স্নিগ্ধ ছায়া পুঞ্জীভূত প্রশান্ত অম্বরে
অগণ্য নক্ষত্রলোক যেতেছে খুলিয়া,
বীচির-বিক্ষোভ-ক্ষান্ত নিঃশব্দ সাগরে
কার তরী গেল চলে আলোক ফেলিয়া ?

তরঙ্গের আস্ফালন নাহি তটভূমে,
থামিয়াছে নর্ম্মলীলা লহরীমালার,
শুয়েছে অশান্ত শিশু মাতৃবক্ষ চুমে
স্বপ্নে শুধু অভিনয় বাসনা খেলার!

মন্দ হয় নগরীর মত্ত কোলাহল,
মন্দিরে মঙ্গলবাদ্য, নিস্তব্ধ জনতা,
বক্ষে মুহ্যমুগ্ধ আলো আবৃত অঞ্চল,
নির্ব্বাণের পূর্ব্বস্মৃতি, নিদ্রার বারতা!

আকাশে করিয়া সাক্ষ্য, বাতাসে মিনতি,
সাগরে মৃণ্ময় দীপ, অন্তিম আরতি!

২২।১১।১২ শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আবেলার্ড ও মধ্য যুগের ইউরোপ।

য়ুরোপের প্রথম ক্রুজেদ বা ধর্ম্মযুদ্ধের পর ফরাসী-দেশে রাজতন্ত্র ও খৃষ্টীয় চার্চ্চ বা ধর্ম্মসঙ্ঘ উভয়ই নিজ নিজ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে যুগে প্যারীনগরে চারিদিক হইতে প্রবল প্রাণস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। প্যারীর সেই প্রথম জাগরণ, সেই প্রথম জীবন-স্পন্দন আবেলার্ড ও তাঁহার বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। মানব-চিন্তাকে স্বাধীনতা দানের ক্ষীণ আলোচনা মাঝে মাঝে এখান সেখান হইতে শ্রুত হইত বটে, কিন্তু আপন প্রাদেশিক সীমানার গণ্ডী ছিন্ন করিয়া তাহারা কখনো য়ুরোপের চিন্তাজগতের মধ্যে সজোরে গিয়া আঘাত দিতে পারে নাই। এই অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত আবেলার্ডের মধ্য দিয়া য়ুরোপের জাগরণের প্রথম সাড়া পড়িল। আবেলার্ডের শিষ্য ব্রেশীয়া বাসী আর্ণও তাঁহার প্রতিধ্বনিরূপে খৃষ্টীয় সভ্যতার প্রাঙ্গণ পোপপ্রাধান্যময় ইতালিতে গিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব স্বাধীনতার বাণী উদারভাবে মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন।

স্বাধীন-চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আবির্ভাব খৃষ্টীয় জগতে সকল যুগেই ঘটিয়াছে। খৃষ্টীয় জগতে চার্চ্চসম্মত খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উদার অথবা সন্দিগ্ধ মত প্রচারের জন্য বহু ব্যক্তি কাষ্ঠ দণ্ডে জীবনাহুতি দান করিয়াছে। খৃষ্টের দিব্যত্ব বা ত্রিত্ববাদ লইয়া আজ কাল পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় সমাজে যে গোলযোগ দূর হয় নাই সেই সকল সংস্কারগত মতের বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় সমাজে সাধকের অভাব

হয় নাই। আমরা মধ্য যুগের চিন্তার ইতিহাস আলোচনা করিতেছি তাই এখান হইতে উদাহরণ দেখাইব—নতুবা প্রাচীনতম খৃষ্টীয় ইতিহাস হইতেও উদাহরণ সংগ্রহ করা কঠিন হইত না।

মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ইতিহাসে ছুইটি লোককে ছুই বিরুদ্ধ শক্তির ছুই মূর্ত্তিমান প্রতিরূপ বলিয়া মনে হয়। একজন আবেলার্ড, আর একজন সাধু বার্ণাড। প্রাকৃতিক জগতে যেমন কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ এই ছুই শক্তির নিয়ত সামঞ্জস্যের চেষ্টায় বিশ্ব নিয়মিত হইয়া আছে, তেমনি চিন্তাজগতের মধ্যেও সেই সংপ্রসারণ ও সংহরণের ছুইটি বিপরীত শক্তির লীলাও আমরা প্রায় সকল যুগের ইতিহাসের মধ্যেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই ছুই বিরুদ্ধ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতপ্রসূত সামঞ্জস্য মানব সমাজকে মঙ্গল বিধান করিতেছে। যাঁহারা মনে করেন যে ইউরোপের মধ্যযুগ একটা অন্ধ বিশ্বাসের যুগ—সে বিশ্বাসে ভক্তির খুব পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু জ্ঞানালোচনা বা সন্দেহবাদের নাম গন্ধও মেলেনা—তাঁহারা হয়ত জানেন না যে সে ধারণা তাঁহাদের নিতান্তই একটা স্থূল সংস্কার। চিরদিনই স্বাধীনতার জন্য মানবের আত্মা ক্রন্দন করিয়াছে।

মধ্যযুগে ফরাসীদেশে বহু লোক প্রচলিত ধর্ম্মের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন—যাঁহারা নির্ভীক চিত্তে প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহারা 'হেরেটিক্' বা নাস্তিক বলিয়া প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অমর হইয়াছেন। আর যাঁহারা আপনাদের অগাধ পাণ্ডিত্যের মধ্যে বাহিরের প্রতিবাদকে লুক্কায়িত রাখিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নৈয়ায়িক পণ্ডিত বা দার্শনিক বলা হইত।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে এই প্রকারের সন্দেহের মূল কোথায়? মূল অনুসন্ধানের জন্য আমাদিগকে অধিক দূরে যাইতে হইবে না—সেই যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের যে কোনো পুস্তকের সেই পরিচ্ছেদটা খুলিলেই তাহা বাহির হইয়া পড়িবে। আমাদের চক্ষের সম্মুখে সেই যুগের য়ুরোপের অবস্থা চিত্রিত হইলে আমরা কি দেখিব? দেখিব এতদিন কূপমণ্ডুকের ন্যায় জীবনযাপন করিয়া য়ুরোপবাসীদের বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে য়ুরোপই বিশ্বসংসার আর খৃষ্টানধর্ম্মই জগৎধর্ম্ম—এবং বাইবেলই একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। এমন সময়ে মুসলমানেরা য়ুরোপের দক্ষিণে সাম্রাজ্য স্থাপন করিল, বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাচীন গ্রীক্ লাটিন দর্শন-বিজ্ঞানের সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। অপর দিকে ক্রুজেদ আরম্ভ হইল। য়ুরোপের জীবন পরিবর্ত্তনের ছুইটি সহায় হইল—একটি স্পেনে জ্ঞানোৎসাহী শিল্পকলানিপুণ এক জাতির রাজ্য সংগঠন আর একটি জেরুজিলামে ধর্ম্মযুদ্ধ। স্পেনের কর্ডোভা নগরের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি খৃষ্টীয় জগতে সুদূর পল্লীপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেই হিদেনদিগের বিদ্যামন্দিরে দলে দলে খৃষ্টীয় যুবক নানা দিগ্দেশ হইতে আগমন করিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিত। ইহার ফলে অনেক সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্র দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল—বাহিরের জ্ঞানালোক আসিয়া তাহাদিগকে নূতন চেতনায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। তার পর দ্বিতীয়ত Crusade এ গিয়া মানুষের চক্ষু ফুটিল। তাহারা দেখিল বিধর্ম্মীদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি, ধর্ম্মবিবেক, জ্ঞানসাহিত্য আছে—এই অনুভূতি মানবের যখন হইল—তখন আর এক পর্দা আবরণ সরিয়া গেল। এই ছুইটি হইল বাহ্য প্রভাব। কিন্তু বাকি থাকিয়া গেল আসল কথাটি, সেটি হইতেছে চর্চ্চ অথবা ধর্ম্মসংঘের প্রধানদিগের সঙ্গে সাধারণ প্রজাদের সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

সেই যুগে চার্চ্চের অতুল ক্ষমতা। তাহার তেজে য়ুরোপ কম্পান্বিত। চার্চ্চই মানবের পথপ্রদর্শক। পুরোহিত পাদরী ও পোপ সকল খৃষ্টানদের আত্মার গতিমুক্তির পথপ্রদর্শক। তাহাদের সহায়তা ব্যতীত স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ, কারণ সেই স্বর্গের চাবি পোপের হাতে। চার্চ্চের উপর অচলা নিষ্ঠা, পোপের উপর অটল নির্ভর—খৃষ্টের দেবত্বে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস না থাকিলে মধ্যযুগে কোনো ব্যক্তির জীবন যাপন সহজ ছিল না। তাহাকে সকলের মতে মত দিয়া মাথা নত করিয়া মানিয়া চলিতেই হইবে। নতুবা মৃত্যুর পর জীবন্ত অনন্ত নরক তাহার জন্য প্রস্তুত। মানুষ কখনো কি অস্বাস্থ্যকর বেষ্টনের মধ্যে চিরদিন থাকিতে পারে? পারে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানের অভাবে সে অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। কিন্তু সত্যালোকরশ্মির কণামাত্র আভাস প্রকাশিত হইবামাত্র কোনো মানব সেই অজ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে বাস করিতে পারে না। আবেলার্ড সেই শেষোক্ত শ্রেণীর 'মানুষ'। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন প্রত্যেক মানবকে স্বাধীন চিন্তা করিবার অধিকার দিবার জন্য যুক্তির দ্বারা সাধনমার্গকে সন্ধান করিবার জন্য—প্রতিবাদের মূর্ত্তি লইয়া মধ্যযুগে তিনি য়ুরোপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আবেলার্ডের সময় পারী বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছিল। পারী বিদ্যালয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র স্থাপিত হইয়াছিল। William of Champeaux সেই বিদ্যামন্দিরের প্রধানাচার্য্য ছিলেন। মধ্যযুগে পারীর বিশ্ববিদ্যামন্দির জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ফরাসীভাষা য়ুরোপের ভদ্রসমাজের ভাষা ছিল,—সাধারণ জন-

মণ্ডলীর কথ্য ভাষারূপে তাহা য়ুরোপের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত।

আমাদের দেশে নবদ্বীপ, মিথিলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে যেমন শিক্ষার্থীরা নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগমন করিতেন—তেমনি মধ্যযুগে য়ুরোপের নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ পারীতে অধ্যয়নার্থে আসিত। কিন্তু এই বিরাট্ বিদ্যামন্দিরের আচার্য্য William of champeauxর অতুল প্রতাপের মধ্যে হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল। কোথা হইতে এক ন্যান্‌ট্‌স্‌বাসী যুবক আসিয়া তর্কযুদ্ধে একদা তাঁহাকে পরাভূত করিল। যুবকের বয়স তখন বিংশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার নাম আবেলার্ড। এই অজাতশ্মশ্রু বালকের নিকট পরাজিত হইয়া ক্ষুব্ধ William তাঁহাকে দেশছাড়া করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন সেইখানকার ধর্ম্ম-যাজক পুরোহিত; তাঁহার তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবে-লার্ডকে পারী ত্যাগ করিতে হইল। আবেলার্ডের ন্যায় পণ্ডিত সে যুগে ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাম্ভিকতা সর্ব্বদা তাঁহার উন্নত মস্তক উত্তোলন করিয়া রাখিত।

পারী হইতে তাড়িত হইয়া কিছুদিন ঘুরিয়া আসিয়া পুনরায় তিনি সেই নগরীতে William এর বিদ্যা-মন্দিরের সম্মুখে তাঁহার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি যাহা প্রচার করিতে লাগিলেন—তাহা সত্য সত্যই খৃষ্টধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিল। খৃষ্ট-ধর্ম্মের মূলগত একটি মত হইতেছে—মানুষ পাপগ্রস্ত এবং সেই পাপ হইতে তাহাকে উদ্ধারের জন্যই খৃষ্ট নরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাদের বিশ্বাস প্রথম নরনারীর আদিম পাপের ফলে (Original sin) মানবকে এত দুঃখ দৈন্য ভোগ করিতে হইতেছে। আবেলার্ড প্রচার করিলেন "বাহি-রের কর্ম্মে পাপ নাই, ভিতরের অভিসন্ধিতেই আসল পাপ। অন্তঃকরণে পাপ না থাকিলে অজ্ঞতা দোষে পাপ, অথবা অভ্যাসগত দোষে পাপ হয় না। খৃষ্টকে যাহারা মারিয়াছিল, তাহারা জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে মারে নাই, অতএব তাহারা কোনো পাপ-কর্ম্ম করে নাই।' আবেলার্ডের এই মত—যে পাপকর্ম্মী পাপী নয়, পাপ-চিন্তাপরায়ণই যথার্থ পাপী—শিক্ষিত সমাজের উপযুক্ত বটে, কিন্তু সাধারণে ইহা সহজে বিকৃত হইয়া কতটা ক্ষতি করিতে পারে তাহা কল্পনা করা যায়।

যুবক আবেলার্ড জটিল গ্রীক্ দর্শন শাস্ত্রকে অতি সরল সহজভাবে মানবের সমক্ষে প্রচার করিলেন। এত-দিন যাহা লাটিনভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল তাহা হঠাৎ সাধারণের মধ্যে আসিয়া পড়াতে তাহা-দের জীবনের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ইহাতে তিনি লোক-প্রিয় হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু খৃষ্টীয় পুরো-হিত পণ্ডিতদের বিষচক্ষে পড়িলেন। লোকে বলিত চার্চ্চ এতদিন যেন নির্ব্বাক ছিল, মানবের সহিত কথা বলে নাই, আবেলার্ড যেন প্রথম তাহার সেই অবগুণ্ঠন খুলিয়া সহস্রবৎসরসঞ্চিত নীরব নিস্পন্দভাব দূর করি-বার চেষ্টা করিলেন।

তিনি প্রচার করিলেন খৃষ্ট মানব ছিলেন। বিশ্বাসী খৃষ্টানরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানে; বর্ত্তমান যুগে খৃষ্টকে মানব বলিয়া অনেকেই মানিয়া লইতেছে; কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মানবের মন এই প্রকারের অখৃষ্টীয় উক্তি শুনিতে অভ্যস্ত হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন মানব যে কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা আপনার শরীরকে ও মানসিক বৃত্তিনিচয়কে অশেষরূপে নিগৃহীত করিয়া থাকে—তাহা নিষ্প্রয়োজন। এই স্বেচ্ছায় মানবের আত্ম-বলিদান, এই অনশন ব্রতোপবাস, তপস্বীদের এত তপশ্চরণ, মন্দিরে ঈশ্বরের সম্মুখে এত অশ্রুবিমোচন, ইহাতে কি লাভ হয়। ঈশ্বর সহজ-দয়ালু, তিনি মানবের বাহ্যিক বাহুল্যের প্রতি উদাসীন। এই মত যতই বিকৃত হইয়া প্রচারিত হউক না কেন তথাপি ইহার মধ্যে বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মাদর্শের বীজ নিহিত ছিল। আবেলার্ড তাঁহার যুগের তুলনায় পাণ্ডিত্যে অসাধারণ ছিলেন, চিন্তার প্রখর-তায় অতুলনীয় ছিলেন। তিনি যথার্থভাবে ভবিষ্যৎ মহাপুরুষগণের অগ্রদূত। মধ্যযুগের ধর্ম্মের মধ্যে যুক্তি-জিনিসটার প্রবেশাধিকার ছিল না, বাধ্যতা ও বিশ্বাস ছিল সেই কালের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। আবেলার্ড বলিলেন— "কেবল অন্ধভাবে বিশ্বাস করিবার জন্য চার্চ্চের পণ্ডিত-গণের গ্রন্থাদি পঠিত হইবে না, সে গুলিকে যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া পড়িতে হইবে।" তিনি আরও বলিয়া-ছেন, "সন্দেহের দ্বারা আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। অনুসন্ধানই আমাদিগকে সত্যালোকে লইয়া যায়।" পৃথি-বীতে একদল লোক আছে—তাহারা অপরকে সমা-লোচনা করিলে পূর্ব্বে বিন্দুমাত্র মনে করে না, যে, তাহা-দিগকে সমালোচনা করিবার জন্য অপরেও প্রস্তুত আছে। এই শ্রেণীর লোকেরা পরের বিশ্বাসে আঘাত দেয় কিন্তু স্বীয় বিশ্বাসে কেহ বিন্দু মাত্র আঘাত দিলেই— আহত লাঙ্গুল সর্প-শাবকের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"তবে তোমরা কেমন করিয়া যাহারা বিশ্বাস করে যে কোনো পুত্তলিকা এই জগত সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা-দের সেই বিশ্বাসে আঘাত কর। যখন তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিবার অধিকার দাও না, তখন কেন অপরের বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ

করিতে যাও।" মানবের স্বাধীন চিন্তা সম্বন্ধে তাঁহার মত খুব উদার ছিল—তিনি গ্রীকদের ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রকে প্রাচীন ইহুদীয় ধর্ম্মনীতি শাস্ত্রের চেয়ে উচ্চতর বলিতে কুণ্ঠিত মাত্র হন নাই।

অসভ্য প্রাচীন লোকদের মধ্যে যে সত্য ধর্ম্ম আছে ইহা মধ্যযুগের খৃষ্টানরা কিছুতেই মানিতে চাহিত না। সুতরাং এই সকল মত নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টানদের কি ভয়ঙ্কর আঘাত দিয়াছিল তাহা আমাদের কল্পনাতীত। পোপ আবেলার্ডের মত নিন্দনীয় বলিয়া প্রকাশ করিলেন—এবং তাহা প্রচারিত হইবার উপযুক্ত নয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার পর তাঁহাকে তাঁহার পুস্তকাদি ভস্মীভূত করিতে হইল। বিশ্বাসী খৃষ্টানদের সহিত তাঁহার যে ভীষণ সংঘর্ষ লাগিয়াছিল তাহা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে আবেলার্ডের বিচিত্রময় জীবনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিব।

ঐতিহাসিক হ্যালাম আবেলার্ড সম্বন্ধে আলোচনায় সংক্ষেপে বলিয়াছেন—"The whole of Abelard's life was the shipwreck of genius"; সত্যই তাঁর জীবনখানি একটি বিরাট ব্যর্থতা। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই একথা অস্বীকার করা যায় না। আবেলার্ডের স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতা ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দে Thomas Aquinas এর মধ্যে দিয়া দেখা দিয়াছিল—ধর্ম্মসংস্কারের যুগে তাঁহারই মত প্রচারিত হইল। Thomas Aquinas এর স্থান মধ্যযুগে খুবই উচ্চে, তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু আলোচনা করা যাইবে।

আবেলার্ডের যৌবনকাল অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। যখন তিনি পারী নগরীতে বাস করিতেছিলেন—তখন ফুলবেয়ার) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার এক আত্মীয়াকে আবেলার্ডের ছাত্রীরূপে প্রদান করেন। আবেলার্ড বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত গভীর অধ্যয়নে রত ছিলেন, তিনি কখনো রমণীর স্নেহভালবাসা পান নাই। তিনি হিলোইসেকে কঠোর অধ্যয়নে নিমগ্ন রাখিতেন ও নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করিতেও ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু হিলোইসে আবেলার্ডকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। এই ভক্তিমতী সাধ্বীরমণীর তুলনায় আবেলার্ড কত নীচে—তাহা হিলোইসের জীবনী আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আবেলার্ড তাঁহার পাপ-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া শেষকালে এই হতভাগ্য রমণীকে গোপনে বিবাহ করিলেন। লোকে আবেলার্ডের এই কীর্ত্তির কথা জানিতে পারিলে ঘৃণায় তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। আবেলার্ড তখন নিরুপায় হইয়া হিলোই-সেকে এক মঠে রাখিয়া আসিলেন। ফুলবেয়ার উত্তেজিত হইয়া আবেলার্ডকে ভীষণভাবে প্রহার করিয়া সেইস্থান হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। আবেলার্ড হিলোইসেকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ-উক্তি বলিয়া জগতে প্রচারিত হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন—"যিনি জগতের কাজের জন্য আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমি বাঁধিয়া রাখিব কেন? সংসারের পুত্র কন্যার ক্রন্দনের দ্বারা তাঁহাকে বিরক্ত করিব কেন? ধাত্রী, পরিচারিকা-দের গল্পে তাঁর চিন্তার ব্যাঘাত সৃজন করিব কেন?" তিনি আবেলার্ডকে মানবের দেহের প্রয়োজনের সকল বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানসলোকে দেখিতেন। তিনি আবেলার্ডকে এক পত্রে লিখিয়াছেন—

"ভগবান জানেন আমি তোমার নিকট হইতে আর কিছুই চাহি নাই, কেবল তোমায় চাহিয়াছিলাম। আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি নাই—বিবাহ-যৌতুকও আমি চাহি নাই। আমি আমার ইচ্ছার তৃপ্তির জন্য বা সুখের জন্য কিছুই চাহি নাই। যাহাতে তোমার সুখ ও প্রীতি জন্মে, তাহাই আমার জীবনের একমাত্র সাধ ছিল। এবং যদিও "সহধর্ম্মিণী" এই কথাটি খুবই পবিত্র, যদিও ইহার দ্বারা আত্মার বন্ধন দৃঢ় হয়, কিন্তু আমার কাছে এই বর্ত্তমান সম্বন্ধই মধুর বলিয়া বোধ হয়। আমি ঈশ্বরকে শপথ করিয়া বলিতেছি যে আজ যদি পৃথিবীপতি সম্রাট্ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন—তথাপি সম্রাজ্ঞী অপেক্ষা তোমার অবিবাহিতা স্ত্রী এই কথা শুনিতে আমার মধুর লাগে।" কিন্তু আবেলার্ড এই প্রেমের উপযুক্ত ছিলেন না—তিনি তাঁহার পত্রের বিশ্লেষণ করিয়া একটি একটি করিয়া উত্তর দিতেন। আবেলার্ড হিলোইসেকে লিখিতেন—"To the bride of christ, to the slave of christ" অথবা অন্যত্র এইরূপও লিখিত আছে "To his dear sister in christ, Abelard her brother in christ." কিন্তু হিলিওসি লিখিতেন অন্য ভাব হইতে; সে ভাবের নাম অহেতুকী প্রেম ছাড়া আর কিছু দেওয়া যায় না। তিনি লিখিতেন—"To her Lord, no to her father; to her husband, no to her brother;—his servant, his wife, no his daughter, his sister—to Abelard, Heloise."

এ কোন্ স্বর্গলোক হইতে প্রেমাস্পদকে লেখা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার মনে কামের গন্ধমাত্র ছিল না। হিলোইসে সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। আবেলার্ডের জীবনে প্রচণ্ড আঘাত পড়িল। এই সময়ে তিনি বিশ্বাসী খৃষ্টান্ সমাজের মুখপাত্র সাধু বার্নার্ডের সহিত বাক্‌যুদ্ধ

করিতে ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিয়া আনিলেন। পারী হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন।

ইতি মধ্যে বিশ্বাসী খৃষ্টানদের সহিত তাঁহার বিবাদের কথাটা বর্ণনা করিতেছি। তিনি যে প্রকারের সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির অবমাননা করিয়া সকল বাঁধ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাসী খৃষ্টানদের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজন ছিল, কারণ যে যুগে ধর্ম্মজীবন গড়ে নাই, সে যুগে আঘাত সহ্য হইবে কেন? খৃষ্টীয় সমাজকে এই প্রচণ্ড আঘাত হইতে রক্ষা করিতে সাধু বার্নাড অবতীর্ণ হইলেন। সাধু বার্নাডের জীবনী আলোচনা করিলে প্রত্যেকেই বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন; বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা উল্লেখ করিলাম না। সৌভাগ্যের বিষয় সেই নৃশংসযুগে এবেলার্ডকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যাকরা হয় নাই। চার্চ্চ বলিতে লাগিলেন যে তাঁহাদের মত না লইয়া আবেলার্ড তাঁহার মত প্রজাগণসমক্ষে প্রচার করিয়া অপরাধী হইয়াছেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া তিনি ডেনিসের মঠে আসিলেন। ডেনিস মঠ পারীর সন্নিকটেই। সাধু ডেনিস ফ্রান্সের আদিগুরু। তাঁহাকে সকলে দেবতার মত শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার মঠ ফরাসী দেশ বিশ্রুত—তাহাদের যুদ্ধধ্বনি ছিল Montjoie St. Denys। সেই সাধুর মঠে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারই উপর সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। তিনি ডেনিসের ফরাসীদেশে আসা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে মঠবাসীরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সেইখান হইতেও বিদায় করিয়া দিল। এই প্রকারে বিতাড়িত হইয়া তিনি ভাবিলেন এইবার শান্তিতে জীবনের বাকি কয়টা দিন কাটাইবেন। তাহাই সংকল্প করিয়া পারীর বাহিরে এক প্রান্তরের মাঝে তিনি বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানের নাম রাখিলেন Paraclete বা Comforter বা শান্তি-আবাস। কিন্তু জ্ঞানপিপাসু লোকেরা তাঁহাকে ছাড়িল না। দেখিতে দেখিতে য়ুরোপের নানা স্থান হইতে শিক্ষার্থীরা আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই প্রান্তর একটি জনপদ হইয়া উঠিল, নির্জ্জন স্থান সজন হইল, নীরব প্রান্তর পাঠার্থীদের পাঠালোচনার তর্কবিতর্কে মুখরিত হইয়া উঠিল। কিছু কাল সেখানে কাটিল। কিন্তু শান্তিসুখ তাঁর ভাগ্যে নাই—মিথ্যা অসত্যকে চোখ কাণ বুজিয়া সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বার্নাড তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ধর্ম্মসম্রাট পোপ ৩য় ইনোসেণ্ট সাধু বার্নাডের ক্রীড়নক ছিলেন। য়ুরোপের সকল নরপতি এই সাধুর ইঙ্গিতে উঠিতেন বসিতেন এমনি তাঁর বল ছিল। বার্নাডের প্রতাপে তাঁহাকে Paraclete হইতে উঠিতে হইল—বিদ্যালয় তুলিতে হইল। আবার তিনি শান্তিহীন বিশ্রামবিহীন ভ্রমণে বাহির হইলেন। তথাপি তাঁহার মনের মধ্যে ইচ্ছা হইলে যে, তাঁর যে প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিরাম লাভ করিতে দিতেছেন না তাঁহাকে একবার সম্মুখ বাক্-সমরে আহ্বান করিবেন। ব্রেশিয়াবাসী আর্ণল্ড সাধু বার্ণাডকে বাক্‌যুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। Sens এর মহাসভায় ফরাসীরাজ, কাউণ্ট, বিশপ প্রভৃতিদের সমক্ষে এই বাগ্‌যুদ্ধ হইবে ঠিক হইল। বার্ণাড তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভাবের জন্য এইরূপ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে যথেষ্ট ইচ্ছুক ছিলেন না। আবেলার্ড উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই উত্তেজিত বিশ্বাসী লোকদের সমক্ষে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ও অবশেষে ধর্ম্মসম্রাট্ ইনোসেণ্টের নিকট আত্ম নিবেদন করিলেন। ইনোসেণ্ট আবেলার্ডকে বিষনয়নে দেখিতেন, কাজে কাজেই এই সুযোগকে তিনি হাতছাড়া করিলেন না। তিনি আবেলার্ডকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। আবেলার্ড এই সংবাদ পাইয়া পুনরায় পলায়ন করিলেন ও অবশেষে রুগ্ন শরীরে ভগ্ন স্বাস্থ্যে Clunyর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ অদ্ভুত সাহস দেখাইয়া এই হতভাগ্য বিশ্বাসবিহীন তার্কিককে স্থান দিলেন। পিতার ন্যায় তাহার যত্ন লইতেন—সেবাশুশ্রূষা তাঁহার সাধ্যমত করিতেন। তারপর সেইখানে দুই বৎসর বাস করিয়া এই মহাত্মা ১১৪২ খৃষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপে মধ্যযুগের দর্শনশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবক, স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা যুক্তিমার্গের পথপ্রদর্শক ত্রিত্ববাদের বিরোধী—খৃষ্টের মানবত্ব প্রতিপন্নকারী এক মহাপ্রাণের জীবলীলা শেষ হইল। তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের প্রথম দার্শনিক দেকার্ত্তের পিতা বলা হয়।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দৈবলীলা।

কিছু নাই, কিছু নাই, তবু সব আছে—
এ কোন অপূর্ব্ব লীলা, প্রভু হে তোমার?
শূন্য নভে নীহারিকা পথ আঁকিয়াছে
শুষ্ক হ্রদে জাগিয়াছে কুমুদ কহ্লার!

শীর্ণ শাখা অন্তরালে বাঁধিল কুলায়
পারাবত, অবিরাম মুগ্ধ অভিনয়,
রৌদ্রতপ্ত জনহীন মধ্যাহ্ন বেলায়
অশ্রান্ত কূজনে গৃহ কলশব্দময়!

সন্ধ্যার আঁধার তীরে, দিনের চিতায়—
আলোক প্রলুব্ধ নেত্র আসে পতঙ্গম
কোন্ ভ্রান্ত আশে? মোহমন্ত্র কবিতায়
কাঁপে ছিন্নতন্ত্রী বীণা, স্মৃতির বিভ্রম!

মরীচিকা চক্ষে এ যে সলিল সম্ভার,
মেরুবক্ষে বসন্তের অনন্ত সঞ্চার!

২৩।১১।১২ শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

—•—

পরলোকগত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন।

গত ১২ই এপ্রিল শনিবার অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন—তিনি জানিতেন যে তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট কিন্তু তিনি ধৈর্য্যের সঙ্গে ভগবানের উপর নির্ভর রাখিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলেন। রোগশয্যায় যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এমন দু-একজনের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি সর্ব্বদাই যেন ভগবানের সান্নিধ্য আবেগের সহিত অনুভব করিতেন, তাই রোগের তীব্র জ্বালা তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। যে যন্ত্রণায় অন্য লোকে অসহ্য হইয়া ছটফট করিত ও চিৎকার করিত, তিনি নীরবে মাসের পর মাস সেই ভীষণ-যন্ত্রণা বহন করিয়াছিলেন, চিকিৎসকদিগের নিকটেও তাহা ব্যক্ত করেন নাই। মনে হয় যেন, তাঁহার জীবনের মূল উৎসটি রোগ-যন্ত্রণার কঠিন আঘাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলের কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার আত্মার অনাবৃত মূর্ত্তি সেই সময়ে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

সাধারণের নিকট বিনয়েন্দ্র বাবু তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিনয়, জনহিতৈষা চরিত্রমাধুর্য্য ও বক্তৃতাশক্তির জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে বৃন্তটিকে আশ্রয় করিয়া এই সকল দলগুলি একে একে তাঁহার জীবনের মধ্যে মেলিয়াছিল ও সৌরভ বিস্তার করিয়াছিল তাহা বোধ হয় চিরদিনই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু হায় আমরা যে দলকেই দেখিতে পাই; মানুষের জীবনের যে গভীর গোপন অন্তরলোকে সকল বিচ্ছিন্ন দল সম্পূর্ণ-সুন্দর ফুলের মত ফুটিয়া উঠে, তাহার সংবাদ কি আমরা রাখি! বাহির হইতে বিনয়েন্দ্র বাবুকে যাহা জানা গিয়াছিল, তাহা ছিন্নদলেরই মত বিক্ষিপ্ত ও খণ্ড পরিচয়, তাঁহার সেই অন্তরের মানুষটি অল্পলোকের কাছেই আপনার পূর্ণ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে।

কারণ, অন্তরের মধ্যে মানুষ যে সম্পূর্ণতার আনন্দকে বহন করে, বাহিরের সকল কাজে কর্ম্মে তাহাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। তাহার জন্য দীর্ঘকাল সাধনা লাগে এবং বোধ হয় বয়সের একটা পরিণতিরও অপেক্ষা থাকে। শুনা যায় যে তিনি রোগাক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিবার সংকল্প করিতেছিলেন;—কি উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রণালী উদ্ভাবিত হইতে পারে, আমাদের যুবকগণকেও কেমন করিয়া দেশের প্রকৃত সেবক করিয়া তোলা যায়,—ইহা তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিবেন এইরূপ একটা উদ্দেশ্য তাঁহার মনকে দোলা দিতেছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি ছাত্রদের মধ্যে ও ব্রাহ্মসমাজের নানা অনুষ্ঠানে কর্ম্ম করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার শক্তি পরিণত হইয়াছে, সম্প্রদায়ের লোকের ও দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও নির্ভর তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং বৃহত্তর উদারতর ভাবে কর্ম্মায়োজন ফাঁদিবার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে—ঠিক সেই সময়টিতে তাঁহাকে কালরোগে আক্রমণ করিল এবং তাঁহার এ জীবনের সকল সংকল্প ও অভিপ্রায়কে বিনষ্ট করিয়া দিল। তাঁহার জীবনের যে একটি বৃহৎ ও সার্থক পরিণাম তাঁহার বন্ধুগণ আশা করিতেছিলেন, তাহা অকালে ব্যাহত হইয়া তাঁহার জীবনের যথার্থ সত্যটিকে এদেশের সকলের কাছে দিবালোকবৎ প্রত্যক্ষ ও সমুজ্জ্বল করিবার অবকাশ পাইল না। তিনি উত্তম পণ্ডিত, অধ্যাপক, বক্তা, ছাত্রহিতৈষী ও ব্রাহ্মসমাজবিশেষের সেবক—এই সকল পরিচয়ই টুকরা টুকরা পরিচয়—কোন মানুষকেই এমন টুকরা করিয়া দেখিতে আমার মন সরে না—কিন্তু তিনি যে মহাপ্রাণ ছিলেন, তাঁহার বিচিত্র সদ্গুণরাশির যে একটি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ভগবদ্ভক্তির দ্বারা তাঁহার মধ্যে বাঁধিয়া যাইতেছিল,—কে

তাঁহার সেই আসল পূর্ণ মানুষটি এই টুকরা মানুষগুলির মধ্যে কৈ? শুধু হাত দেখা, পা দেখা, চক্ষু কর্ণ নাসিকা দেখা অথচ সমগ্র শরীরটিকে না দেখা যেমন, শুধু পণ্ডিত, অধ্যাপক, বক্তা, মধুর ও পবিত্রস্বভাব ব্যক্তি বলিয়া কোন মানুষকে দেখাও তেমনি, তাহাতে সমগ্র মানুষটিকে দেখা যায় না।

বিনয়েন্দ্র বাবু নববিধান ব্রাহ্মসমাজের লোক ছিলেন; কিন্তু নববিধানকে যাহারা ভক্ত কেশবচন্দ্রেরই বিশেষ বিধান বলিয়া মনে করেন, তিনি কখনই তাঁহাদের দলভুক্ত ছিলেন না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনই এ যুগের বিশেষ বিধান; ভক্ত কেশবের জীবনে ও বাণীতে সেই পরমবিধানের বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছিল। অবশ্য কেহ কেহ মনে করেন এই বার্ত্তাকে তিনিই প্রথম উপস্থিত করেন, কিম্বা ইহার সত্যতাকে নিজ জীবনে যেরূপ গভীরভাবে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এমন অপর কেহ করেন নাই। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু আমি জানি যে সাহিত্যে, শিল্পে যে কোন অনুষ্ঠানে যে কোন লোকের দ্বারা এই পূর্ব্বপশ্চিমের মিলন বার্ত্তা প্রচারিত হউক, কেশবচন্দ্রের যথার্থ অনুগামীগণ তাঁহাকে পরম আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন যে সেই ব্যক্তির দ্বারা নববিধানের কার্য্যই অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং তিনি তাঁহাদেরি বন্ধু ও সহায়। আমি ইহা সুনিশ্চিতরূপে জানি বলিয়াই যথার্থ বিধানবাদীকে অস্বীকার করিতে পারি না। এ যে ভগবানের বিধান, এ যুগে তিনি যে পূর্ব্বপশ্চিমকে উদ্বাহবন্ধনে বাঁধিবেন বলিয়া নানাদিক হইতেই নানা আয়োজন করিতেছেন। শুধু কেশবচন্দ্র কেন, তাঁহার পূর্ব্বগামী রামমোহন ইহারি বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের পরেও এদেশের বহু মনীষী এই বার্ত্তাই প্রচার করিতেছেন, এই বাণীকেই নিজ নিজ জীবনে মূর্ত্তিমান্ করিতেছেন, এ যুগে এই যজ্ঞানুষ্ঠানকেই সফল করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছেন। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ইঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া আমি মনে করি।

বিলাত হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার বন্ধুমণ্ডলীকে তিনি যে অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার এই তীর্থযাত্রায় যাঁহারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রিয়বন্ধুকে আমি আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি। তাঁহারা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের, বিশেষ দলের, বা দেশের বিশেষ কোন অংশের লোক নহেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুসমাজের নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি সকল রহিয়াছেন, খৃষ্টান সমাজের ব্যক্তি সকল রহিয়াছেন, আমার সহযোগী এদেশীয় ও ইউরোপীয় অধ্যাপকগণ আছেন, আমার প্রিয়তম ছাত্রগণ আছেন—ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার লোক আছেন, এবং যে শাখাসমাজে বালবৃদ্ধ সকলের সঙ্গে আমি ভগবানের উপাসনা করিয়াছি তাঁহারাও আছেন।" এই অনুবাদিত পত্রাংশ হইতেই তাঁহার চিত্তের উদারতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন সাধনের কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা পূর্ব্বদেশের ধর্ম্মসাধনার বিশেষত্ব ও গভীরতার কথা বুঝি সম্যক অবগত নহেন। কিন্তু এ কথা মনে করা ঠিক্ নহে। মিলন সাধন মানে তো কোন এক পক্ষের বিশেষত্বকে বা মহিমাকে খর্ব্ব করা নয়,—পরস্পরকে ঠিকমত চেনা ও চিনিয়া পরস্পরের কাছে প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থক হওয়া। আজ হোক্, কিম্বা শত বৎসর পরে হোক্—এই পরিচয় একদিন পাকা করিতেই হইবে, বিবাহমাল্য লইয়া একদিন উভয়পক্ষকে মুখামুখী বসিতেই হইবে এবং সম্মিলিত হইয়া জগতে পরিপূর্ণ মঙ্গলকে জন্মদান করিতেই হইবে। এ স্বপ্ন যাঁহারা চিরজীবনের জ্ঞানের, প্রেমের ও কর্ম্মের সাধনার ভিতর হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কাল্পনিক ও ভাবুক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না—কারণ আজ যাহা স্বপ্ন কাল তাহাই সত্য, আজ যাহা ভাবুকের ধ্যান দৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে কাল তাহাই কর্ম্মীর কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে সফল হইয়া উঠিবে।

বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের জীবনের বিশেষত্ব কোথায়, এই প্রশ্নই আমি নিজেকে সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আমি বলিয়াছি তিনি পণ্ডিত ছিলেন, উত্তম অধ্যাপক বা বক্তা ছিলেন, ইহাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় নাই। কিন্তু তিনি এই মহাভাবের ভাবুক, এই মহা স্বপ্নের দ্রষ্টা ছিলেন, তিনি এই মহাবাণীর উদ্গাতা ছিলেন। তাঁহার এই স্বরূপ জানিয়া তাঁহার সকল রচনা পাঠ করিলে তবেই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিমাপ হইবে, ছাত্রদের জন্য তিনি কেন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেন—তাহাদের কোন্‌ভাবে কোন্ রসে মাতাইয়া তুলিতে চাহিতেন—তাহা বুঝা যাইবে, তাঁহার বক্তৃতাশক্তির যেটি প্রাণ—এই ভবিষ্যদৃষ্টি বা vision—তাহাও ধরা পড়িবে।

তাঁহার এক ইংরাজী রচনার কিয়দংশ এখানে অনুবাদ করিয়া দিই:—"মতবাদের দিক্ দিয়া, তত্ত্বের দিক্ দিয়া সাধনার দিক্ দিয়া, সকল দিক্ দিয়া বর্ত্তমান উদার ধর্ম্মের সম্মুখে এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে যে পূর্ব্বদেশকে পশ্চিমকে ভাল করিয়া জানিতে ও বুঝিতে হইবে এবং পশ্চিমদেশকেও পূর্ব্বকে ভাল করিয়া জানিতে ও বুঝিতে

হইবে। প্রাচ্য পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ সকল (The Sacred Books of the East) যাহা অনূদিত হইতেছে, তাহারা পূর্ব্বদেশকে একটুখানি ছুঁইবার মত সুযোগ দান করে মাত্র। অবশ্য তাহার সার্থকতা কম এ কথা বলি না। তা ছাড়া তাহারা বহু প্রাচীনকালের দ্বারা নিশ্বসিত একটি বিরাট্ প্রাণের স্পর্শ দেয়। এখন প্রাচী'র জীবিত ব্যক্তিগণ এবং প্রতীচি'র জীবিত ব্যক্তিগণ পরস্পরকে 'পবিত্র' বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবেন,—এই একটি অপেক্ষা আছে।

* * * *

"পূর্ব্ব এবং পশ্চিম কি কখনই পরস্পরকে বুঝিতে পারিবে না? * * চিন্তা, জীবন এবং চরিত্রবলের মহোচ্চ পুণ্যশিখরে আরোহণ না করা পর্য্যন্ত এই বোধ পূর্ণ হইবে না। কিন্তু সে আরোহণ কি সহজে ঘটিবে, নানা ঘাত-প্রতিঘাত নানা বিরোধ ভিন্ন তাহা কি সম্ভব হইবে? ভারতবর্ষ যে আত্মার সাধনার কথা বলে, দীর্ঘকাল কঠিন সংগ্রামের পর ভারতবর্ষের কোটী কোটী জনগণ সেই আত্মাকে জানিবে। তখনি কিসের জন্য বাঁচা দরকার, কিসের জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন তাহা সে বুঝিবে। প্রত্যক্ষ সাহায্য এবং প্রত্যক্ষ বিরোধের দ্বারাও এই বোধনে অন্য জাতি তাহার সহায়তা করিবে। আত্মা যে ব্যক্তিগত মাত্র নয়, সমষ্টিগত; সকল মানুষের যে সমষ্টিভাবে এক মহা পরিণাম আছে; পশ্চিমদেশের এই আইডিয়ার জন্য পশ্চিমের কাছে পূর্ব্বদেশ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক। এই ভাবটি যাহাতে আরও বিকাশ লাভ করে, তজ্জন্য কি পশ্চিম পূর্ব্বদেশকে সাহায্য করিবে না? * * তেমনি পূর্ব্বদেশ কি পশ্চিমকে বলিবে না—ভগবানকে ভক্তি করিয়া যে পরমাশান্তি তাহাই লাভ করিবার জন্য জীবনযাত্রায় প্রবৃত্ত হও! বাস্তবিক উভয়ের পক্ষেই এই কথাই সত্য যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে মিলিত হইয়া করজোড়ে শ্রীভগবানকে এই প্রার্থনা নিবেদন না করিবে—"প্রভু, তোমার স্বর্গরাজ্য আসুক, পৃথিবীতে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!" ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা নিজ নিজ বিশেষ সার্থকতা কোনমতেই পাইবে না।"

অধ্যাপক ভাসোয়ানী লিখিয়াছেন যে বিনয়েন্দ্র বাবুর সকল বিক্ষিপ্ত রচনা ও উপদেশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে, তিনি এইরূপ আশা করেন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষটির আসল স্বরূপটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। "অন্তরতর ধর্ম্ম" তাঁহার আদর্শ ছিল, যে অন্তরতর ধর্ম্ম ব্যষ্টিকে এবং সমষ্টিকে মিলিত করে, ধ্যানকে এবং কর্ম্মকে সঙ্গত করে, ভক্তিকে এবং চারিত্রশক্তিকে গ্রথিত করে। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখা, পূর্ব্বদেশের সাধনার বিশেষত্ব, এবং সমস্তের মধ্যে জগতের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করিবার প্রয়াস, পশ্চিমদেশের সাধনার বিশেষত্ব—এই উভয় সাধনায় মিলিয়া যে গভীরতর অন্তরতর ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিয়াছে বিনয়েন্দ্রনাথ সেই ধর্ম্মেরই সাধক ও প্রচারক ছিলেন। এবং সেই সাধনা উদ্যাপন করিলেই যে পূর্ব্বপশ্চিমের মিলনকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হয়, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জেনিভায় আহূত উদার ধর্মমতাবলম্বিগণের মহাসভায় বিনয়েন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই তাঁহার আলাপ ও বক্তৃতা যে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ তিনি নিজ জীবনে সেই মহাবিধানের সাক্ষ্য বহন করিয়াছিলেন, যাহা সর্ব্বোচ্চ সত্যকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশে প্রত্যক্ষ করিবার বিধান। যিনিই তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার গভীর ধর্মবিশ্বাসে ও মহৎ ভাবুকতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

"To suffer unto victory, to die unto eternal life, that is the glory of man"—যে পর্য্যন্ত না জয়লাভ কর, সে পর্য্যন্ত পরম দুঃখকে বহন করা, অনন্ত জীবনের জন্য প্রাণ বিসর্জন করা,—ইহাতেই তো মনুষ্যত্বের গৌরব। কে জানিত, বিনয়েন্দ্রনাথের এই কথা তাঁহারি সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য্যরূপে খাটিবে! তাঁহাকে তো অসহ্য রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল, কিন্তু তিনি পরাস্ত তো হইলেন না! কি নীরব আত্মনিবেদনের দ্বারা তিনি সকল দাহকে শান্ত করিলেন, সকল বিষকে অমৃতে পরিণত করিয়া দিলেন! মৃত্যুকে মাতৃহস্তের আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ করিলেন! এই যে জীবন্ত বিশ্বাস, এই যে সত্যনির্ভরশীলতা, ইহাতেই তাঁহার সকল ভাবুকতা জোর পাইয়াছে, সত্যের উপর ভর পাইয়াছে, শূন্যে হাওয়া হইয়া উড়িয়া যায় নাই। এমন মানুষের মৃত্যুকে একদিক্ দিয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের এবং দেশের ক্ষতি বলিতেই হইবে, অন্যদিকে এই মৃত্যুর দ্বারা তাঁহার যে বৃহৎ পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা সকলেরই লাভের বিষয় হইল, সকলের স্মৃতির সামগ্রী হইয়া রহিল। তিনি সম্প্রদায়বিশেষে থাকিয়া যেমন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে বদ্ধ হন নাই, তাহার পরিচয় আমরা পুনঃপুনঃ পাইয়াছি—সেইরূপ আমাদেরও সকলেরি সময় আসিয়াছে যখন সকলের সত্যকে আমরা অনায়াসে গ্রহণ করিব,—সকল সম্প্রদায়ের, সকল দেশের এবং সর্ব্ব মানবের। এ কথা আমি একবারও বলিতেছি না যে বিনয়েন্দ্রনাথ যে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সেখানকার কোন সংস্কার তাঁহার মধ্যে ছিল না—কিন্তু তেমন করিয়া মানুষকে সম্প্রদায়কে, কোন

দেশকে কোন অনুষ্ঠানকে দেখিলে চলিবে না। সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু ত্রুটি আছেই, কোথাও না কোথাও অমিল হইবেই—তথাপি যদি পূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া যাই তবে দেখিব যে ত্রুটি ও অমিলের সংখ্যাই অধিক নয়, সদ্‌গুণের ও মিলের সংখ্যাই অধিক। দেখিব পরস্পরকে শ্রদ্ধা দান করিতে অগ্রসর হইলেই বাধাগুলি আপনিই সরিয়া যাইতে থাকে। সর্ব্বত্র সত্যেরই জয় হোক্, সম্প্রদায়ের নয়!

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

বিশ্বসংবাদ।

জাতি-সংঘাত।

আমরা এই সংখ্যায় অন্যত্র "জাতি-সংঘাত" নামক রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছি।

আমেরিকান কোন কাগজে দেখিতেছিলাম যে এই জাতি-সংঘাতের প্রশ্নটিকে এখনকার কালের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও কঠিন প্রশ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে—ইহা সকল সভ্যজগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে এবং ক্রমশই ইহার প্রসার অধিকতর হইতেছে।

আমেরিকাকে আজকাল নানা সঙ্কর জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিতে হইতেছে, তাহারা অনেকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতায় ও অন্যান্য নানা বিষয়ে নিজ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সুতরাং এখন আর এটা একটা ঘরাও ব্যাপার নয়—শ্বেতাঙ্গগণ সম্মতিলতার (ভোট) দ্বারা যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে, এ কথা বলা যায় না।

যে সকল প্রদেশ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ভাবা প্রয়োজন সেখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই পীতাঙ্গ এশিয়াবাসী, কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিগণের সহিত শ্বেতাঙ্গদিগের মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কর জাতিগণ। মিশ্রিত জাতির সংখ্যার অনুপাতের সহিত সেই সেই প্রদেশীয় শ্বেতাঙ্গের বর্ণ-বিদ্বেষের একটা সম্বন্ধ আছে। যেখানে শ্বেতাঙ্গেরা অবাধে বিভিন্ন বর্ণের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে সেখানে বর্ণ-বিরোধ তেমন তীব্র নহে।

এশিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী পীতাঙ্গ। সেখানে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা অল্প এবং তাহাদের সহিত পীতাঙ্গগণের অল্পই মিশ্রণ ঘটিয়াছে। পর্ত্তুগিজরা তাহাদের এশিয়াবাসী প্রজাগণের সহিত এমন অবাধে মিশিয়া গেছে যে তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ-রেখা আর নাই। ফিলিপিনদের সহিত স্পেনীয়দের যথেষ্ট রক্তসম্মিশ্রণ হইয়াছে, তবে পর্ত্তুগিজদের মত নহে। কিন্তু আমেরিকান্, ইংরাজ, ফরাসী, ডচ্ প্রভৃতি জাতিগণ বিজিত জাতিদের সহিত যথেষ্ট দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে। এই দূরত্ব ক্রমেই বাড়িয়া গিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবকে সুতীব্র করিয়া তুলিতেছে।

চীনের আধুনিক যুদ্ধ-প্রণালী গ্রহণ।

চীনবাসীরা একাধিকবার শ্বেতাঙ্গদের নিকট লাঞ্ছিত ও পরাভূত হইয়া এবং আপনাদের অতি পুরাতন যুদ্ধপ্রণালী অনুসরণে আপনাদের মধ্যে সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে জাপানের পথ অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছে।

দেখা যায়, যে সকল প্রদেশে সমজাতীয় লোকের বাস নাই, সেখানেই শ্বেতাঙ্গ জাতিরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। সেই সকল স্থানে শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা—সকল বিধির প্রবর্ত্তক। এতদিন তাহাদিগকে প্রবল পক্ষ জানিয়া দেশীয় লোকেরা সমস্ত সহ্য করিয়াছে—কিন্তু বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই তাহাদের বিরুদ্ধে জাগরণের ভাব দেখা যাইতেছে। এই সকল প্রদেশে যাহারা শিক্ষিত-লোক তাহারা জাপানের পথ গ্রহণ করিতে চায়, কিন্তু তাহারা জানে যে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আরও বিস্তার না ঘটিলে তাহাদের আশা সফল হইবে না।

নিরক্ষর জনগণ কেবল জানে যে শ্বেতাঙ্গেরা পীতাঙ্গদিগের নিকটে পরাজয় লাভ করিয়াছে। সুতরাং দেশ হইতে যাহাতে তাহারা দূর হইয়া যায়, এই প্রবল ইচ্ছার জন্য তাহারা যে কোন নায়কের অনুবর্ত্তী হইতে আপত্তি করিবে না। আজ ফিলিপিনেরাও যে স্বাধীনতাকামী হইয়াছে—ইহার মূলে জাপানের জয়লাভ—সকল দুর্ব্বল জাতি তাই ভরসায় মাথা জাগাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

পীত জাতিদের ভাব।

পীতজাতিগণ বরাবরই শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্বে বিরক্তিবোধ করিয়াছে। জাপানকে যে একসময়ে যুক্তরাজ্য সাহায্য করিয়াছিল তাহা আমেরিকা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে বলিয়া জাপানীরা ভুলিয়া যাইতেছে। যুক্তরাজ্য ফিলিপিনোদের স্বপ্নাতীত স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়াছে; তথাপি ফিলিপিনোরা আমেরিকানদের মোটেই পছন্দ করে না। ইহার একটি কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে স্পেনীয়েরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা না দিয়াও, সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ফিলিপিনোদের খুবই নিকটে টানিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকানরা এ পর্য্যন্ত তাহা করে নাই—এবং কখনো করিবে এমন ভরসাও নাই।

এশিয়ার আশিকোটি লোকেরা পীতাঙ্গদের প্রতি

এঙ্গলো স্যাক্সন্ জাতিদের মনের কিরূপ ভাব তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। যতই এই সকল জাতি সভ্যতাশিখরে দিন দিন আরোহণ করিতেছে—ততই তাহাদের নিকট ইহা সুস্পষ্ট হইতেছে।

লাটিন আমেরিকা অর্থাৎ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বর্ণপ্রশ্ন অন্য প্রকার আকার গ্রহণ করিয়াছে দেখা যায়। তাহার সহিত এশিয়ার বা ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি অধিকৃত উত্তর আমেরিকার অবস্থা যথাযথ মিলে না। এই পার্থক্যের নানা কারণ।

যে সকল য়ুরোপীয় দক্ষিণ বা মধ্য আমেরিকায় গমন করিয়াছিল, তাহারা উপনিবেশকল্পে বাসস্থান অনুসন্ধানে যায় নাই; তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ধন সঞ্চয়। তাহারা সংখ্যায় অনেক আসে নাই,—এবং সর্ব্বাপেক্ষা অনুদার স্থান হইতেই তাহারা আসিয়াছিল,—যথা স্পেন ও পর্টুগাল আঙ্গলো স্যাক্সনদের মধ্যে যেমন ভিন্ন বর্ণের প্রতি বিদ্বেষ চরিত্রের মধ্যে দৃঢ় হইয়া মুদ্রিত আছে, ইহাঁদের তেমন ছিল না। তার পর তাহারা অর্থের জন্য আসিয়াছিল—সঙ্গে স্ত্রী, পরিবার খুব কম লোকেরই ছিল।

লাটিন আমেরিকান সংমিশ্রিত জাতি।

শ্বেতাঙ্গ নারীর অভাবে ও বর্ণ-বিদ্বেষের তীব্রতা মনের মধ্যে ছিল না বলিয়া স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজরা তদ্দেশীয় লোকদের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার ফলস্বরূপ মেস্‌টিজো জাতির উৎপত্তি। স্পেনীয় আমেরিকাতে ১৭ লক্ষ শ্বেতাঙ্গের বসতি, আর মেষ্টিজোর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০-৯০ লক্ষ।

শ্বেতাঙ্গের সংখ্যার অল্পতা হেতু, ভূমির উর্ব্বরতার জন্য এবং অতিসহজভাবে ইণ্ডিয়ানরা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া—অতি প্রাচীনকাল হইতেই সে দেশে ভূম্যাধিকার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার ফলে একদল নিপীড়িত জাতি শ্বেতাঙ্গ অথবা মেষ্টিজো প্রভুদের অধীনে দুর্ব্বিষহ জীবন-ভার বহন করিতেছে।

জাপান।

জাপান সর্ব্বপ্রথমে আন্তর্জাতীয় রাজনীতিকে বর্ণ-প্রশ্নের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর শক্তি হইবার জন্য জাপান বরাবরই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং সেইজন্য তাহাকে একটি বিষম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাহার উন্নতির জন্য তাহাকে দেশ অধিকার করিতে হইবে। ইহার ফলে যে বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। পাশ্চাত্য জাতি-সকল যতই পূর্ব্বদিকে বিস্তৃতি লাভ করিবে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে তাহাদের বিজয় নিশান উড়াইবে, জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা দিন দিন ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিবে। কিন্তু সকল শ্বেতাঙ্গ জাতিকে তাড়াইবার সামর্থ্য জাপানের না থাকায় তাহাকে অন্যান্য প্রাচ্যজাতির সহিত দলবদ্ধ হইয়া এই কার্য্য সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অথচ কেমন করিয়া তাহা সম্ভব! এখানে সেই বর্ণ-প্রশ্ন সকল সমস্যা-পূরণ করিয়া দিতেছে। কারণ, ভিন্ন বর্ণ যত ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছে, এমন আর কিছুতে করে নাই।

জাপান এই ঘৃণাকে খুব করিয়া প্রধূমিত করিতেছে। তাহার কৃতকার্য্যতাও যথেষ্ট হইয়াছে। ফিলিপাইনে অসন্তোষ ফরাসী ইন্দো চীনে সেই অশান্তি ও চীনে আমেরিকান্ শিল্পজাত দ্রব্যের বয়কট্ জাপানের জন্যই অনেকটা হইয়াছে। কিন্তু চীনের এই দুর্দ্দিনে আজ কাল যদি যুক্তরাজ্য তাহাকে সাহায্য না করিয়া, চীনশত্রুদের সহিত যোগদান করিয়া কাজ করেন তাহা হইলে রুষ জাপানের সম্বন্ধের ন্যায় চীন আমেরিকান সম্বন্ধ দাঁড়াইবে।

জাপান দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরদিকস্থ দেশগুলিকে রাজনৈতিক সাহায্য করিতে গিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে। জাপানী নৌবাহিনী মেক্সিকোর বন্দরে উপস্থিত হইলে, সেখানকার অধিবাসীরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিয়াছিল। জাপানীগণকে তাহারা আপনাদের লোক বলিয়া মনে করিল।

জাপান ক্রমে ক্রমে এমন জায়গায় গিয়া পৌঁছিতেছে যেখানে যুক্তরাজ্যের উন্নতির পথে সে যে কেবল বাধা দিবে তাহা নহে, ক্রমে জাপান তাহার সবিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে। জাপান ফিলিপিনোদের নিকট গিয়া বলে,—"আমেরিকানরা স্পেনীয়দের ন্যায় শ্বেতকায়; কিন্তু আমরা জাপানী, তোমাদের ন্যায় পীতাঙ্গ। তোমাদের আমাদের এক পূর্ব্বপুরুষ।" এই যুক্তিতে মানবের মনকে সহজেই মুগ্ধ করে।

শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে দুইটি মত আছে। তাহাদের মধ্যে একদল স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজদের ন্যায় আন্তর্জাতিক-বিবাহের পক্ষপাতী এবং সামাজিক অধিকার হিসাবে সকলকে সমানাধিকার দিতেও কুণ্ঠিত নয়। দ্বিতীয় দল বলেন যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ কখনো সম্ভব নয় সমানাধিকার কখনো দেওয়া চলে না। ইহাঁদের মধ্যে একজন বলেন যে এই হীন বর্ণের দ্বারা কোনো মহৎ ভাব বা কর্ম্ম কখনো লভ্য নহে, আর একদল ন্যায় অন্যায় নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া এই বিশ্বাস করেন যে এই সকল হীনবর্ণকে যদি যথার্থ সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া যায় তবে তাহারাও শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই জাতি-সংঘাতে যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শেষ কোথায় কে বলিতে পারে! আমরা দেখিতেছি প্রতিবৎসরই এই প্রশ্নটি প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। যে সকল জাতি অত্যন্ত নিরীহ ও শান্তস্বভাব ছিল, ক্রমাগত আঘাত পাইয়া তাহাদের ভিতরকার আদিম প্রতিহিংসা-পরায়ণ প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। পরজাতির প্রতি উদারতা, তাহাকে তাহার জীবনের পথে বিঘ্নসঙ্কটে সাহায্য করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টার কোন লক্ষণই কোথাও দেখা যায় না। মানবহিতৈষাকে বরণ করিয়া যাহারা একদা অন্য দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, আপনাদের অধিকৃত স্থানও অন্যের সুবিধার জন্য অনায়াসে ছাড়িয়া দিয়াছিল, যেখানে মানুষের প্রতি অন্যায় অবিচার হইতেছে সেইখানে বীরের মত গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আজ দুর্ব্বল জাতির প্রতি অত্যাচার বসিয়া বসিয়া দেখিতেছে। ন্যায়ধর্ম্ম ও মানবহিতৈষাকে ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে। জাতিসংঘর্ষের এই আগুণ পৃথিবীতে কবে নির্ব্বাপিত হইবে?

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আয় ব্যয়।

চৈত্র মাস, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮৩।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১০৬২।/৯
পূর্ব্বকার স্থিতি	...	৪৮৩৫৯
সমষ্টি	...	১৫৪৬৸/৬
ব্যয়	...	১০২১॥৶/৬
স্থিত	...	৫২৪।৶/০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদিব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৪০০৲

সমাজে ক্যাশে মজুত

১২৪।৶/০

৫২৪।৶/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১২৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয় ২০০৲

এককালীন দান।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী কমলাবালা দেবী ১০৲

২১২৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৪৸০
পুস্তকালয়	...	১৮৸৶/০
যন্ত্রালয়	...	৭৯৬॥৶/৯
সমষ্টি	...	১০৬২।/৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫০।৶/৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৪৫৶/৯
পুস্তকালয়	...	১০৩॥৶/৯
যন্ত্রালয়	...	২২২।৶/৩·
সমষ্টি	...	১০২১॥৶/৬

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
„ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
„ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
„ অবনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
„ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
„ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	১০৲
„ হিরণ্ময়ী দেবী	১৲
„ সৌদামিনী দেবী	২৲
„ সুহাসিনী দেবী	১৲
„ চারুবালা দেবী	১৲
„ নরেন্দ্রবালা দেবী	১৲
„ ইরাবতী দেবী	১৲
„ সুকেশী দেবী	১৲
„ সরোজিনী দেবী	১৲
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী	১৲

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৪।

৮৩৯ সংখ্যা ১৮৩৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

উদ্বোধন।

সমুদ্রের প্রত্যাখ্যাত শঙ্খের মতন
পড়ে আছি তীরে,
নিতান্ত নীরব গীতি মুদ্রিত জীবন
বহিতেছি ধীরে!
সঙ্গীতের অন্তহীন সিন্ধুতল হ'তে
আসিয়াছি আমি,
সে অনন্ত ছন্দোগাথা মোর মর্ম্মপথে
বাজে দিন যামী!
এস যোদ্ধা, এস মোর উদ্দাম প্রণয়ী,
দুই হাতে ধরে,
মূক চিত্তে তূর্য্যনাদ দৃপ্ত বিশ্বজয়ী
দাও তুমি ভরে,'
জাগিয়া বিস্ময় ভরে, জাগাই আমার
স্তম্ভিত সঙ্গীত,
প্রত্যেক বালুকাকণা ভুলি তন্দ্রাভার
আনন্দ-স্পন্দিত
উদার একাগ্র কণ্ঠে করুক প্রচার,
অতলের সামগান গভীর অপার।

২৩।৪।১৩ শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

—•—

বিলাতের পত্র।

কাল সকালে লণ্ডনে এসে পৌচেছি। এবারেও আটলাণ্টিক অশান্ত ছিল—কিন্তু আমাদের প্রকাণ্ড জাহাজটাকে তেমন করে বিচলিত করতে পারে নি। তাই এবার আমাকে সমুদ্রপীড়ায় ভুগতে হয় নি।

এবার আমার নববর্ষের প্রথম দিন এই সমুদ্রযাত্রার মাঝখানে এসে দেখা দিল। প্রত্যেকবার আমার চির-পরিচিত পরিবেষ্টনের মাঝখানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করেছি—কিন্তু এবার আমার পথিকের নববর্ষ, পারে যাবার নববর্ষ। এবারকার নববর্ষ যেন আমার কূল থেকে বিদায় নেবার হুকুম নিয়ে এল—আমাকে যাত্রার আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেল। এবার ডাঙার মায়া একেবারে ছেড়ে দিয়ে কর্ণধারের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে ভেসে পড়তে হবে। সেখানে পথের চিহ্ন চোখে পড়ে না—কিন্তু যিনি হাল ধরে আছেন, তিনি পথ জানেন এই কথা মনে নিশ্চয় জেনে বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাঙায় স্থির হয়ে বস্‌তে গেলে ভিত খুঁড়তে হয়, শিকড় গাড়তে হয়, সঞ্চয় বিস্তার করতে হয়, আর চল্‌তে গেলে শিকল খুলতে হয়, নোঙর তুলতে হয়, স্থাবর সম্পত্তির বোঝা ফেলে আসতে হয়—এখন থেকে সেই সমস্ত চিরাভ্যাসের আয়োজন থেকে নিষ্কৃতি নেবার আয়োজন করতে হবে। অসত্য থেকে সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির পথে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে যাত্রা। এ পথের কি কোনোদিন অন্ত আছে? কিন্তু যেমন অন্ত নেই তেমনি গম্যস্থান যে প্রতিপদেই—আমরা যেমন চলছি তেমনি পৌচচ্ছি—আমাদের এই চিরজীবনের যাত্রায় চলা এবং

পৌঁছন একেবারে একই কথা। তা যদি না হত তাহলে অনন্ত চলা যে অনন্ত শান্তি হয়ে উঠত।—কিন্তু সমস্ত জীবনব্যাপারের মজাই হচ্চে ঐ, তার অপূর্ণতা এবং পূর্ণতা একেবারে এপিঠ ওপিঠ হয়ে দেখা দেয়—যখন খেতে থাকি তখন আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক গ্রাসই খাওয়া—খাওয়ার আনন্দের জন্যে খাওয়ার অবসানের অপেক্ষা করতে হয় না। তাই এবারকার নববর্ষের দিন মনকে বারবার বলিয়ে নিলুম, মন, চল্‌তে হবে, এখন থেকে পিছন দিকে তাকাবার অভ্যাস ছাড়তে হবে। যদি সামনের মুখে চলবার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দেওয়া যায় তাহলেই মিথ্যার মায়া কাটানো সহজ হবে—তাহলেই, কে কি বল্‌চে, কে কি ভাব্‌চে, কিসে কি হবে এ সব কথা ভাবনার একেবারে দরকারই হবে না। কেন না, যখন আমরা মনে করি বসে থাকাটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তখনই আশেপাশে যে কেউ আছে সকলেরই মুখের দিকে তাকাতে হয়, এবং পোঁটলা পুঁটলি, ঘটিবাটি কাঁথা কম্বল সমস্তই একেবারে ভূতের মত পেয়ে বসে;—যে হতভাগা দশের দাসত্ব করে তাকে প্রতিদিন যে আপনাকে ও পরকে কত বঞ্চনা করতে হয়, কত মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হয় তার ঠিকানা নেই—কিন্তু অনন্তের পথে চলতে হবে এই কথাটা ঠিক ভাবে বলতে পারলে জীবন আপনিই সত্য হয়ে ওঠে—কেন না আমাদের জীবনের সত্য স্বরূপটাই হচ্চে তাই, অনন্তের পথে চলা, রাস্তার মাটি কামড়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নয়। এই জন্যে বসে থাকতে গেলেই জীবন মিথ্যা হয় এবং চলতে আরম্ভ করবামাত্রই সত্য হতে থাকে। তাই ত আমাদের প্রার্থনা, অসতোমা সদ্‌গময়—অসত্য থেকে সত্যের দিকে আমাদের নিয়ে যাও—ঐ নিয়ে যাওয়ার দিকেই সমস্ত সার্থকতা—বসিয়ে রাখাতেই যত গেরো। ধনমান যখন আমাদের ধরে বেঁধে রাখ্‌তে চায় তখনই আমাদের গুরু এসে বলেন ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে বরঞ্চ উট গলতে পারে কিন্তু ধনী কখনো স্বর্গরাজ্যে যেতে পারে না। সে কথার মানে হচ্চে ধনসঞ্চয় যে আমাদের ধরে রাখতে চায়, এবং ধরে রাখ্‌লেই আমরা স্বরূপ থেকে ভ্রষ্ট হই—কারণ, বসে থাকার দ্বারাই আমরা অন্তের মধ্যে আটকা পড়ি, চলার দ্বারাই আমরা অনন্তকে উপলব্ধি করতে পারি—সেই উপলব্ধিতেই আমাদের একমাত্র সত্য। সেই জন্যেই আমাদের প্রার্থনার ভিতরকার কথা হচ্চে—গময়, গময়, গময়,—আমাদের বসিয়ে রেখো না। কারণ, যখনই আমরা চলতে থাক্‌ব তখনই প্রকাশ আমাদের মধ্যে প্রকাশমান হবেন। বীণাযন্ত্রে তারের উপর তার চড়াতে থাকলেই যে সঙ্গীতের প্রকাশ হয় তা নয়—তারের উপর ঝঙ্কার দিয়ে তাকে সচল করলে তবেই সঙ্গীতের আবির্ভাব বীণাকে সফল করে তোলে। আমরা খোঁটা আঁকড়ে ধরে বসে আছি বলেই আমাদের আবিঃ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারচেন না। তাই এবারে যাত্রার পথে নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা গেল—এবার আমাদের "শান্তানুকূল পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ" হোক্।

"আমাদের যাত্রা হল সুরু,
এবার ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার—
এবার তুফান উঠুক বাতাস ছুটুক্
ভয় করিনে আর—তোমারে করি নমস্কার।"

কেন না, যে যাত্রা করেছে—"অথ সো ভয়ং গতো ভবতি।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভক্তবাণী।

(Paslms of David)

৫ম।

আমার ধ্যান-মুগ্ধ হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় বাণী, অবধান কর হে প্রভু। আমার আর্ত্তকণ্ঠের প্রার্থনায় বধির থাকিও না, হে আমার রাজেন্দ্র! হে আমার জীবনেশ্বর!

প্রভাতে আমার কণ্ঠ প্রথমেই তোমার দ্বার-প্রান্তে কম্পিত আলোক শিখার মত উর্দ্ধগামী হইবে—তুমি তাহাকে নিরাশ্রয় করিও না, দয়াময়। ধর্ম্মরাজ তুমি অপাপ-বিদ্ধ, কলুষ তোমার সন্নিকট হইতে সক্ষম নহে। অবিবেকী তোমার দৃষ্টির প্রসাদ লাভ করিতে পারিবে না। —পাপকারীর সম্মুখে তুমি উগ্র প্রলয়ঙ্কর।

দীনবৎসল, ভক্তিনম্র হৃদয়ের অর্ঘ্য বহন করিয়া, সোপানে সোপানে আমি দিব্য মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইব—তোমারি দয়ার ভরসায় দরিদ্র আমি, পূজা উপচার নিবেদন করিতে সাহসী হইব।

আমাকে সততার পথে অগ্রসর কর হে নেতা, শত্রুগণ আমার প্রত্যেক পদক্ষেপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে—তোমার পথ আমার চক্ষের সম্মুখে সরল গতি লাভ করুক।

বৈরীগণের বাক্য বিশ্বাসের বার্ত্তা মান্য করে না, অন্তঃকরণ তাহাদের ক্রূরতায় পরিপূর্ণ, তাহাদিগের

মুক্ত কণ্ঠ অবারিত মৃত্যুর আগার, তোষামোদ করিতে তাহারা বড়ই চতুর।

তাহারা যেন আপন দুর্ব্বুদ্ধি দোষে আপনি নষ্ট হয়—অসংখ্য স্বপনের মধ্যে জীবন তাহাদের ভ্রষ্ট; আশ্রয়রহিত। তাহারা তোমার প্রতিকূলেও বিদ্রোহ প্রচার করিয়াছে!

বিশ্বাসীকে নন্দিত কর হে ভক্তবৎসল, তাহাদিগের উৎসাহিত কণ্ঠে নিরন্তর জয়সঙ্গীত ধ্বনিত হউক—হে আর্ত্তহারী দুর্দ্দিনের আশ্রয়, তোমার নাম সঙ্কীর্ত্তনে তাহাদের হৃদয় পরম আনন্দ উপভোগ করুক।

হে ভগবান, তোমার আশীর্ব্বাদই পুণ্যবানের রক্ষা-মন্ত্র, তোমার প্রসাদ চির দিনই ভক্তের বিপত্তিবারণ দুর্ভেদ্য বর্ম্ম।

ষষ্ঠ।

প্রভুহে, বিরূপ হইয়া পরুষ বাক্য বলিও না, আমাকে নির্ম্মল করিতে হইলেও রোষানলে দগ্ধ করিও না।

দয়া কর দীনবন্ধু, আমি যে দুর্ব্বল, ব্যামোহপীড়িত আমাকে নিরাময় করিয়া দাও। আমার আত্মাও বিচ্ছেদক্লিষ্ট; কতদিন আর হে বন্ধু, দূরে ফেলিয়া রাখিবে?

ফিরিয়া আইস হে আমার জীবন-অধিকারী, আত্মার সিংহাসন পরিগ্রহ কর, তোমার অসীম দয়ায় আমার পরিত্রাণ কর।

মৃত্যু তোমার স্মরণকে বাধাহত করে, চিতাশয়নে নাম গানের অবসর কোথায়? হৃদয়ের আর্ত্ত নিনাদে আমি পরিশ্রান্ত, বধির প্রায়, অশ্রুজলপ্লাবনে সিক্ত শিথিল শয্যায়, আমি অশান্তি-সাগরে সন্তরণ করি।

দুঃখদাহে কাতর নেত্র অন্ধপ্রায়, বৈরতাড়নায় তাহার দৃষ্টিশক্তি পরিক্ষীণ। সুদূরে বিতাড়িত হউক আমার অকল্যাণকারী সকল, প্রভু আজ আমার ক্রন্দন-কাতর গদগদ কণ্ঠের আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন।

যাহারা আমার আত্মার বিরুদ্ধাচরণ-প্রয়াসী, তাহারা যেন বিধ্বস্ত হয়, তাহারা যেন বারম্বার পরাভূত হইয়া লজ্জা প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম।

হে প্রভু, হে বিশ্বসম্রাট আমার নিতান্ত নির্ভর তোমারি উপরে, আমার বিশ্বাস তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। যে কেহ, যাহা কিছু আমার আত্মাকে বিপত্তিগ্রস্ত করে—সেই সকল হইতেই আমাকে উদ্ধার কর। রিপুগণ যেন হিংস্র জন্তুর ন্যায় আমাকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে সমর্থ না হয়। হে দৈত্য-নিসূদন, তুমি ভিন্ন আর কাহার ভরসা করিতে পারি?

যদি আমি, হে ধর্ম্মরাজ, মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল, পুণ্যের বিরুদ্ধে পাপকে প্রয়োগ করিয়া থাকি, তবে আমার মুক্তি হয় না যেন—তবে রিপুগণ আমার আত্মাকে বিধ্বস্ত করুক, আমার জীবন তাহাদের নির্ম্মম পদাঘাতে ধূলিশায়ী হউক—আমার সকল গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যাউক। রুদ্র মূর্ত্তিতে একবার প্রকাশিত হও হে দেবাধিদেব, তোমার প্রলয় বিধানে আততায়ীগণকে পলায়নপর করো—হে জাগ্রত ভৈরব, বিচারাসনে দৃঢ় রূপে অধিষ্ঠিত হও।

তোমার ন্যায়ের বিধান জয়যুক্ত হউক হে মহেশ্বর, তোমাতে নির্ভরপরায়ণ প্রজাগণ যেন নিরাশ হয় না।

জন সাধারণের বিচার করো হে বিচারক, তোমার ধর্ম্মবিধানে আমাকেও পরীক্ষা করিয়া লও হে প্রভু—আমার সুকৃতি তুমি কখনই ব্যর্থ করিবে না। পাপকারীর মন্দ চেষ্টার বিরাম হউক—ধার্ম্মিককে প্রতিষ্ঠা দান করো—ন্যায়কারী বিধাতা সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের নিয়ামক।

তুমিই আমার রক্ষার একমাত্র উপায়, হে প্রভু—অন্তরের কথা তিনিই জানেন, সম্যক বিচার করিতে কেবল মাত্র তিনিই সমর্থ।

সৎপথের পান্থকে তিনিই পন্থা নির্দ্দেশ করেন—দুর্ব্বুদ্ধি-নীতদিগের প্রতি তিনি চিরদিনই বিরক্ত।

বিপথচারী যদি সুপথে না ফিরিয়া আসে, তবে তাঁহার দীপ্ত করবাল উদ্যত হইল, তাঁহার শিথিল ধনুগুর্ণ দ্বিগুণ দৃঢ় হইবে।

মৃত্যুর উপায়সকল প্রস্তুত, ব্যভিচারীদিগের শাসনের নিমিত্ত, তাঁহার তীক্ষ্ণ সায়কসকল শাণিত হইতেছে।

পাপকারীর দুর্দ্দশা দেখ, অমঙ্গলের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া পাপকে ধারণ করিয়াছিল, বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কেবলমাত্র মিথ্যাকেই জন্মদান করিয়াছে।

যে পঙ্ককুণ্ড স্বহস্তে খনন করিয়াছিল, আজ তাহাতে আপনি ডুবিয়া মরিল। আমি ন্যায়বান প্রভুর নিরন্তর স্তবগান করিব, তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তনই আমার জীবনের নিত্য-ব্রত।

অষ্টম।

হে ঈশ্বর, হে আমাদিগের সকলের প্রভু—এ পৃথিবীতে তোমার নামের মত অপার্থিব মধুর আর কি আছে? তোমার মহিমা ত্রিলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

শিশু এবং বালকের মুখের ভাষায় তুমি কি মহাশক্তি বিধান করিয়াছ, সকল শত্রুই তাহার সম্মুখে হীন বল, সকলেই অবনতমস্তক।

যখন তোমার নিপুণ হস্তের আকাশ-রচনা পর্য্যবেক্ষণ করি, যখন চন্দ্রতারকার চির জ্যোতি হৃদয়ঙ্গম করিতে

সমর্থ হই তখন বুঝিতে পারি আমরা মানবেরা কত ক্ষুদ্র; তবুত তাহাদিগকেও তুমি বিস্মৃত হও না—তাহার দ্বারেও অতিথি হইতে অসম্মান জ্ঞান কর না!

দেবদূতের পরেই তাহাকে সম্মান পদবী দান করিয়াছ, তাহার মস্তক ধর্ম্মগৌরবের দীপ্ত মুকুটে শোভমান করিয়াছ।

তাহাকে তোমার সৃষ্টির অধীশ্বর করিয়া দিয়াছ—অপর সকলেই তাহার শাসনাধীন।

প্রান্তরচারী জীব, বিমানচারী পক্ষী সকল, জলচর মৎস্য, সামুদ্রিক সকল প্রাণীই তাহার আজ্ঞাপরবশ।

হে ঈশ্বর, হে আমাদিগের সকলের প্রভু—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার নাম মহিমার তুলনা কোথায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অন্ত্যজ জাতি।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার মহাশয় নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি মারাঠি ভাষায় প্রদান করেন :—

প্রাচীনকালে আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন, তখন ভারতবর্ষ নানা আদিম মানবজাতির বাসস্থান ছিল। এই উভয় জাতিরই মধ্যে বিরোধের একটা তীব্র ভাব যে জাগিয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। এই সকল আদিম অধিবাসিগণকে আর্য্যগণ দস্যু বা দাস বলিয়া অভিহিত করিলেন। কিছুকালের মধ্যে এই অনার্য্যদের কোনো কোন শাখা আর্য্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইতিমধ্যেই আর্য্যসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে তিনটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল—শূদ্র নামে এই অনার্য্যগণ স্বতন্ত্র আর একটি শাখা হইয়া আর্য্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইল। শূদ্র নামের মূল অর্থ কি তাহা এখন গবেষণা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; কিন্তু বোধ হয় যে শূদ্র নামের কোনো আদিম জাতিকে আর্য্যসমাজভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল বলিয়া সেই হইতেই এই নাম প্রবর্ত্তিত হয়। পরে আর্য্যগণ যতই পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ক্রমেই এই আদিম মানবজাতির নব নব দলের সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন—ততই এই নাম আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইল ও নূতন জাতিরাও শূদ্রনামে অভিহিত হইল।

প্রথমে এই সকল অনার্য্য আদিম জাতিরা আর্য্যগণের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা অত্যন্ত কঠিন। ইহার ফলে কয়েক শতাব্দী যাইতে না যাইতেই প্রাচীন আর্য্যভাষা পালিভাষায় রূপান্তর প্রাপ্ত হইল—এবং আরও কিছুকাল পরে মাগধী, সুরসেনী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি নানা প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত হইল। এই সকল প্রদেশে যাহারা নিতান্ত ঘৃণ্য কর্ম্ম না করিত তাহাদিগকে শূদ্রজাতির অন্তর্গত করা হইল। কিন্তু যাহারা বন্যভাবে পশুশীকার ও অন্যান্য হেয় কর্ম্ম করিয়া আর্য্যসমাজ হইতে অনেক দূরে থাকিল—তাহাদিগকে সমাজে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। প্রাচীনকালের চণ্ডাল, পুলকস, নিষাদ, বেণ, বিলকার, শ্বপচ, ক্ষত্রউগ্র, ধিগ্বান, মদ্গু প্রভৃতি কত হীন জাতির নাম প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে। কিন্তু তাহারা সমাজের এমন কি অন্যায় কর্ম্ম করিত? নিষাদগণ মৎস্যব্যবসায়ী—মদ্গু ও আরও কয়েকটি জাতি বন্য পশু শীকার করিয়া জীবনধারণ করিত। পুলকসদের মৃত্তিকা-গুহাবাসী প্রাণীশিকার করা ও ধিগ্বানদের চর্ম্ম-পরিষ্কার করা জীবিকার উপায় ছিল। অন্যদের রাজাদেশে জল্লাদের কর্ম্ম করিতে হইত, কেহ বা নগরীর মৃত মনুষ্য বা পশুকে নগরপ্রাচীর ও পরিখার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিত। চণ্ডালরা মৃতব্যক্তির কন্থা ও বস্ত্রাদি পরিধান করিত। লৌহের অলঙ্কার তাহাদের দেহের ভূষণ ছিল। অন্য কোনো জাতির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বন্ধন হইত না। ভোজননিরত ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করা চণ্ডালের পাপ বলিয়া নির্ণীত ছিল,—তাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হওয়া শাস্ত্রের বিধি ছিল।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে নীচ কর্ম্মই এই এক ঘৃণিত সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু যতই এই সকল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল—ততই অন্যান্য নানা কর্ম্ম করিবার জন্য তাহারা লালায়িত হইয়া উঠিল। অথচ সমাজে তাহাদের ঘৃণিত জীবন পদে পদে তাহাদের উন্নতির পথের বাধা স্বরূপ হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্রমে নানা কর্ম্মে তাহাদিগের প্রবেশ লাভ হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্র দেশের আদিম অধিবাসীরা মহার নামক এক ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জাতি সমুদ্ভূত। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে সেই মহার জাতি গ্রামে গ্রামে গিয়া কর সংগ্রহ করিয়াছে এবং এই প্রকারে রাজকোষে অর্থাগমের সহায় হইয়াছে। গ্রামের অতিথিগণকে পরিচর্য্যা করা তাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। মহারাষ্ট্র দেশে অন্ত্যজ জাতিকে অতি প্রাচীন কালেই তুলিয়া লওয়া হইয়াছে কিন্তু ভারতের অপর স্থানে সে দৃষ্টান্ত কোথায়!

এই অন্ত্যজ জাতিকে তুলিয়া লইবার চেষ্টা অতি

প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যায়। যেমনি সমাজের পীড়নে মানবের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়াছে—অমনি এক এক সময়ে এক এক মহৎ ব্যক্তির উদার চেষ্টায় সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণ লোক সংস্কারের দাস; সে উদারতার বিরোধী—প্রাচীনের মোহ তাহার চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মহাপুরুষগণ চিরদিনই মানবের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতিকে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের যুগে এ প্রকারের শত শত উদাহরণ দৃষ্ট হয়। তারপর চিরদিনই সে চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে। আজ যে সকল নীচজাতিকে গ্রহণ করিবার উদার ভাব ভারতে দেখা দিয়াছে তাহা নূতন নহে। বুদ্ধ তাঁহার সংঘের মধ্যে এই নীচজাতির দীনতম দীনকে স্থান দিয়াছিলেন। সুনীত নামক জনৈক নীচকুলোদ্ভব থের (স্থবির) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নীচকুলে আমার জন্ম; আমি বড়ই দরিদ্র ছিলাম। আহার সারাদিনে মিলিত না। সর্ব্ব নিকৃষ্ট কর্ম ছিল আমার উপজীবিকা। ঝাড়ুদারের কাজ করিতাম। সকলে আমাকে ঘৃণা করিত। আমি সকলকে সবিনয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতাম। তারপর একদিন দেখিলাম বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণ পরিবৃত হইয়া মগধ রাজধানী পাটলিপুত্রে প্রবেশ করিতেছেন। ঝুড়ি ফেলিয়া আমি তাঁহার চরণ সেবা করিবার জন্য সেখানে উপনীত হইলে তিনি দয়া করিয়া দাঁড়াইলেন। আমি ভগবান বুদ্ধকে বলিলাম "প্রভু আমি সন্ন্যাস লইব, আমাকে গ্রহণ করুন।" তিনি তখন বলিলেন—'হে ভিক্ষু, এখানে এস!' প্রভু আমাকে সেই মহা সম্মানে ভূষিত করিলেন আমি ভিক্ষু সংঘে প্রবেশাধিকার পাইলাম।" এই কি একটি ঘটনা! আরও কতবার তিনি এই অস্পৃশ্য জাতিকে গ্রহণ করিয়াছেন।

মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণের পর সকল ভিক্ষুর চরণধূলি লইতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মন্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন—"মহারাজ! কত নীচ জাতি হইতে লোক আসিয়া ভিক্ষু সংঘে প্রবেশ করে—রাজা হইয়া সকলের কাছে মাথা নত করা ও পদরেণু গ্রহণ করা আপনার শোভা পায় না।" প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোক মন্ত্রীকে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন।

'অশ্বলায়ন সূত্র' নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থে বুদ্ধের সহিত অশ্বলায়নের জাতিভেদ লইয়া বিচার হইতেছে। বুদ্ধ বলিলেন "মানবের প্রকৃতির মধ্যে জাতিভেদের সংস্কারের কোনো প্রকার চিহ্ন পাওয়া যায় না।" তিনি অশ্বলায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য উৎকৃষ্ট অরণিকাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ করিলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়—কিন্তু যখন চণ্ডাল বা পুলকস শুষ্ক কদাকার কাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ করে তখন কি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না?" অশ্বলায়ন বলিলেন—"নীচজাতির লোক কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে অগ্নি বাহির হইবে বৈকি।" তখন বুদ্ধ বলিলেন—"ইহা হইতে কি বুঝা যাইতেছে? যখন প্রথম তিন উচ্চ বর্ণ উৎকৃষ্ট অরণিকাষ্ঠ লইয়া অগ্নি প্রস্তুত করিতেছেন এবং নানা ক্রিয়া কর্ম্ম করিতেছেন—অথচ সামান্য কাষ্ঠ দিয়া চণ্ডাল পুলকস প্রভৃতি নীচজাতি অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে—তখন তাহারাও উচ্চবর্ণের ন্যায় অধিকার পাইবে।" বুদ্ধ যখন নীচ বর্ণকে গ্রহণ করিয়াছেন তখন ব্রাহ্মণরা কেন করিবেন না? অথচ তাঁহারা বুদ্ধকে দশ অবতারের একজন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পরযুগে যে সকল মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাও নীচ জাতিকে ঘৃণা করেন নাই। ভাগবতে আছে—"আমাতে (ঈশ্বরে) ভক্তি চণ্ডালকে পবিত্র করে, এবং তাহাদের জন্মের সকল কলঙ্ক হইতে তাহারা মুক্ত হয়।" তুকারাম বলিয়াছিলেন,—"জাতি বিচার আমি জানি না; বৈষ্ণব—সে যে জাতির হউক না কেন—আমার নমস্য।" মহাত্মা চৈতন্যও বঙ্গদেশে একদিন বলিয়াছিলেন, হরিভক্ত চণ্ডাল ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ভগবানকে যিনি প্রাণ ভরিয়া ডাকিবেন তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ভারতবর্ষ চিরদিনই সে শ্রদ্ধা পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া দিয়াছে। চর্ম্মকার রুহিদাস, ছিপিপুত্র (দর্জ্জি) নামদেব, মুসলমান জোলা কবীর, ভক্তমাল গ্রন্থ-প্রণেতা অন্ত্যজ জাতীয় অস্পৃশ্য নাভাজী, এবং আরও অসংখ্য সাধুরা ভারতবাসী নরনারীর শ্রদ্ধা পাইয়াছেন। আজ ভারতবাসীর তাহা ভুলিলে চলিবে না।

মরুদেশে মলদে নগরীতে দেবমুরারী নামে এক সাধু হরির উপাসক। সেই নগরীতে রুহিদাস নামে এক চামারও বাস করিত। সে প্রতিদিন প্রাতে শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে স্নানে যাইত এবং পবিত্রজল লইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া সকলকে উহা লইবার জন্য আহ্বান করিত। দেবমুরারী স্নান সমাপন করিয়া আসিতেছেন; হঠাৎ তাঁহার কর্ণে সেই আহ্বানধ্বনি প্রবেশ করিল—তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া জল চাহিলেন। চামার ব্রাহ্মণকে কেমন করিয়া জল দিবে ভাবিয়া পায় না; তখন দেবমুরারী বলিলেন—"পবিত্র জলে ও সাধারণ জলে অনেক পার্থক্য; আর সাধুমণ্ডলীতে মহর ও চামার বলিয়া কিছুই পার্থক্য নাই।" যাহা ব্যক্তিগত জীবনে ভারতে সহস্র সহস্র সাধু দেখাইয়াছেন, তাহাই জাতীয় জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। যাহা সাধু মহাত্মাদের সাধনের সামগ্রী, যাহা শ্রেষ্ঠ জীবনের আদর্শ, তাহা

লৌকিক জীবনেও প্রকাশিত করিতে হইবে, তাহা জাতীয় জীবনে ফুটাইতে হইবে। বুদ্ধ, কবীর, চৈতন্য, রামদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ভারতের সমক্ষে যে আদর্শ দিয়াছিলেন তাহা ভারতবাসী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নাই। আর কত দিন আমরা এমনি করিয়া এই অন্ত্যজ জাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখিব! আমরা বাহিরে নানাদেশের নানাজাতির লোকের সংস্পর্শে আসিতেছি তাহাদিগকেতো অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখি না! আর আমাদের দেশের ভ্রাতৃগণ যাহাদের সহিত আজ তিন সহস্র বৎসর একত্র বাস করিতেছি তাহাদিগকে এমন করিয়া অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণায় দূরে ঠেলিয়া রাখিব! কিন্তু কেবল মুখে ঘৃণা করি না একথা বলিলেও এখন চলিবে না—তাহাদের মধ্যে জ্ঞান শিক্ষার একটা পিপাসা জাগাইতে হইবে। তাহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া লোক বাহির হউক! তাহাদিগকে আমাদের সমানরূপে পরিগণিত করিতে হইবে এবং সমগ্র অন্ত্যজ জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে আরও নিকটে টানিতে হইবে। সমাজের মধ্যে ইহাও দেখিতে হইবে যে উপযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মান্তর গ্রহণে কোনো বাধা প্রাপ্ত হন না। মহর বা চণ্ডাল ইচ্ছা করিলে সূত্রধর, তাঁতি মিস্ত্রী হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে। মানুষ যেন মানুষকে চাপিয়া মারিতে চেষ্টা না করে—ভগবানের রাজ্যে এত বড় পাপ আর নাই।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গীতাপাঠ।

গীতা-শাস্ত্রের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোনো একটি স্থানেও কৈবল্য-মুক্তির উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে, গীতাপুস্তকের যে-পাতারই গায়ে আঙুল ঠ্যাকানো যায়, সেই পাতার মধ্য হইতেই জীবন্মুক্তির সুর ঝঙ্কার দিয়া ওঠে। বিশেষতঃ, কৈবল্য মুক্তি গীতাশাস্ত্রে স্থান পাইবার কথাই নহে; কেননা, গীতাতে মহাভারতের যে-জায়গার কথা বলা হইতেছে, সে জায়গায়—অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য যাহা কাজে লাগিতে পারে সেইরকমেরই উপদেশ শোভা পায়, তা বই কৈবল্য-মুক্তির উপদেশ কোনোক্রমেই শোভা পায় না। যুধিষ্ঠির হইলে—তাঁহাকে শৌর্য্যবীর্য্যাদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শোভা পাইত মন্দ না। কিন্তু অর্জ্জুনকে শূরবীর হইতে বলাও যা, আর, মধ্যাহ্ন দিবাকরকে তেজঃশালী হইতে বলাও তা, দুইই সমান। শ্রীকৃষ্ণ তবে অর্জ্জুনকে কী হইতে বলিতেছেন? অর্জ্জুনকে তিনি না-হইতে বলিতেছেনই বা কি?—জ্ঞানী হইতে বলিতেছেন—কর্ম্মী হইতে বলিতেছেন—যোগী হইতে বলিতেছেন—ভক্ত হইতে বলিতেছেন। কিন্তু এতগুলা কথার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন—এক কথাতেই মামলা চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; সে কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জীবন্মুক্ত হইতে বলিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবন্মুক্তি বলে কাহাকে? জীবন্মুক্তি যে, বলে কাহাকে, তাহার গোটা-তিনেক নমুনা গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—প্রণিধান কর:—

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥"

ইহার অর্থ এই:—

যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়; আর, কর্ম্ম যাহা করিবে তাহা—অনাসক্ত হইয়া—সিদ্ধি-অসিদ্ধির মধ্যস্থলে সমভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া—করিবে। সমত্বেরই নাম যোগ।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥"

ইহার অর্থ এই:—

স্থিরবুদ্ধি এবং মোহমুক্ত ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া প্রিয় ঘটনাতেও হর্ষোন্মত্ত হইবেক না, অপ্রিয় ঘটনাতেও উদ্বিগ্ন হইবেক না।

তৃতীয় অধ্যায়ের সার্দ্ধ উনবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ॥"

ইহার অর্থ এই:—

যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা অনাসক্ত হইয়া করিবে। আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ত্তাপুরুষ পরম পদ প্রাপ্ত হন। জনকাদি রাজর্ষিরা কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গীতার এই সকল উপদেশের মাতৃচ্ছন্দে সাধকের জীবন পরিগঠিত হইলে, তাঁহার অন্তরাকাশে সংশয় এবং কুসংস্কারের মেঘ কাটিয়া ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাঁহার মনোরাজ্য হইতে বিষয়কামনার দলবল দূরীভূত করিয়া

সুবিমল সদানন্দ আবির্ভূত হয়, এবং তাঁহার জীবনযাত্রা পথে স্বার্থপরতার কণ্টকাকীর্ণ বনজঙ্গল উচ্ছিন্ন করিয়া সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানপরতা আবির্ভূত হয়; আর তাহা যখন হয়, তখন সাধক জীবন্মুক্ত হ'ন।

গীতাপুস্তকে মুক্তি বা মোক্ষ শব্দ নাই বলিলেই হয়, কিন্তু ব্রহ্মনির্ব্বাণ শব্দ যেখানে সেখানে ছড়ানো রহিয়াছে। গীতার যে-যে-স্থানে ব্রহ্মনির্ব্বাণ-শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানের শ্লোকের মর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিলে এটা বেস্ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রকার মহর্ষি বলিতে চাহিতেছেন আর কিছু না—যুবরাজের পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার পূর্ব্বাধিকৃত যৌবরাজ্য যেমন আপনা হইতেই উত্তরাধিকৃত সাক্ষাৎ রাজ্যে পরিণত হয়, তেমনি জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহত্যাগ হইলে অথবা দেহত্যাগের পূর্ব্বে প্রাক্তন কর্ম্মের বাসনা-সংস্কারাদি নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার যত্নার্জ্জিত জীবন্মুক্তিই অযত্ন-সুলভ ব্রহ্মনির্ব্বাণে পরিণত হয়। শাস্ত্রকার মহর্ষিদেবের মতে—জীবন্মুক্তি কেমন সহজে—কেমন নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে—ব্রহ্মনির্ব্বাণে পরিণত হয়, তাহার একটি সেরা নমুনা গীতাশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—প্রণিধান কর :—

গীতা-শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সর্ব্বশেষের দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি ॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি ॥"

ইহার অর্থ এই :—[শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন]

যে সাধক সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া—স্পৃহাশূন্য হইয়া, স্বার্থশূন্য হইয়া, অহঙ্কারশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তিলাভ করেন। ইহারই নাম পার্থ, ব্রাহ্মী স্থিতি। এ স্থিতি যিনি প্রাপ্ত হ'ন—সংসারের মায়ামোহ আর তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। এই স্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়া সাধক অন্তকালেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন।"

বলা হইয়াছে "যে সাধক ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হ'ন (অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া—স্পৃহাশূন্য, স্বার্থশূন্য এবং অহঙ্কারশূন্য হইয়া বিচরণ করেন) তিনি শান্তিলাভ করেন; সংসারের মায়ামোহ আর তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না।" ইহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সে সাধক জীবন্মুক্ত। ইহার অব্যবহিত পরেই বলা হইয়াছে "এই স্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়া সাধক অন্তকালেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন।" ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, বৃদ্ধ পিতার দেহত্যাগ হইলে যুবরাজ যেমন যৌবরাজ্যের আধিপত্যে ভর দিয়া থাকিয়া উত্তরাধিকৃত রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হ'ন, তেমনি, জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্রাহ্মীস্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়া অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণের কূলে উপনীত হ'ন।

প্রশ্ন॥ আমি সোজাসুজি এইরূপ বুঝি যে, নির্ব্বাণই ব্রহ্মনির্ব্বাণের সারসর্ব্বস্ব। এ কথা যদিই বা সত্য হয় যে, গীতা-শাস্ত্রের কোনো স্থানেই কৈবল্য মুক্তির উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণ হইতেছে না যে, ব্রহ্মনির্ব্বাণ—কৈবল্য-ছাড়া আর কিছু। ফল কথা এই যে, সাংখ্য-দর্শনের মতানুমোদিত কৈবল্য মুক্তিও যেমন, আর, গীতা-শাস্ত্রের মতানুমোদিত ব্রহ্মনির্ব্বাণও তেমনি, দুইই মহা-নির্ব্বাণেরই আর এক নাম। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যে কোন্‌খানটায় তাহা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

উত্তর॥ ব্রহ্মনির্ব্বাণ শব্দের অর্থ তুমি যদি এইরূপ বুঝিয়া থাকো যে, নির্ব্বাণই ব্রহ্মনির্ব্বাণের সারসর্ব্বস্ব, তবে তাহার জন্য গীতাশাস্ত্র কোনো অংশেই দায়ী নহে। তাহা দূরে থাকুক—এইমাত্র তোমাকে আমি গীতার যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, ব্রাহ্মীস্থিতিই ব্রহ্মনির্ব্বাণের সার সর্ব্বস্ব। এ বিষয় লইয়া তোমার সহিত বাদানুবাদের কোনো প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমার বিবেচনায়—ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ কিসের নির্ব্বাণ এবং কিসের নির্ব্বাণ নহে—তাহা গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখানোই তোমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিবার খুব সহজ উপায়; অতএব তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

৫ম অধ্যায় ২৪শ, ২৫শ, ২৬শ শ্লোক।

"যোহন্তঃসুখোহন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং ॥"

ইহার অর্থ এই :—

(১)

অন্তরাত্মাতেই যাঁহার সুখ, অন্তরাত্মাতেই যাঁহার রতি, অন্তরাত্মাই যাঁহার জ্ঞানের আলোক, সেই ব্রহ্মভাবা-পন্ন যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন।

(২)

ব্রহ্মনির্ব্বাণ লভেন সেই সকল ঋষি-শ্রেণীর লোক যাঁহারা ক্ষীণপাপ, সংশয়শূন্য, সংযতাত্মা এবং সর্ব্বভূত-হিতে রত।

(৩)

কামক্রোধ-বিমুক্ত সংযতচিত্ত আত্মবিৎ যতীদিগের হাতের কাছে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান।

উদ্ধৃত শ্লোক-তিনটির প্রথমটিতে এই যে বলা হই-য়াছে "অন্তরাত্মাতেই যাঁহার সুখ, অন্তরাত্মাতেই যাঁহার রতি, অন্তরাত্মাই যাঁহার জ্ঞানের আলোক, সেই ব্রহ্মভাবা-পন্ন যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন" ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, অন্তরাত্মাতে যে প্রকার সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় সেই সুবিমল ব্রহ্মানন্দ, আর, অন্তরাত্মা যে প্রকার জ্ঞানের জ্যোতিষ্কেন্দ্র সেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, এ দুয়ের কোনোটি এক মুহূর্ত্তও ব্রহ্মনির্ব্বাণের সঙ্গ ছাড়ে না। তবেই হইতেছে যে, ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মনির্ব্বাণের ডা'ন হাত বাঁ হাত।

দ্বিতীয় শ্লোকটিতে এই যে বলা হইয়াছে "ব্রহ্মনির্ব্বাণ লভেন সেই সকল ঋষিশ্রেণীর লোক—যাঁহারা ক্ষীণপাপ, সংশয়শূন্য, এবং সর্ব্বভূত-হিতে রত" ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের অন্তরে—নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইতে, কেবল, পাপ, সংশয়, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য এবং হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সকল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তা বই, সর্ব্বভূতের হিতকারিতা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না।

তৃতীয় শ্লোকটিতে এই যে বলা হইয়াছে "কাম-ক্রোধ-বিমুক্ত সংযতচিত্ত আত্মবিৎ যতীদিগের হাতের কাছে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান, ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ শুধুই যে কেবল নির্ব্বাণ তাহা নহে, একদিকে যেমন তাহা কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি আলেয়ার দলবলের নির্ব্বাণ, আর একদিকে তেমনি তাহা আত্ম-জ্ঞানের সূর্য্যোদয়।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, গীতা পুস্তকের যেস্থানেই যখন ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে, সেইস্থানেই—জ্ঞান, আনন্দ, জগতের হিতানুষ্ঠান প্রভৃতি আত্মার গোড়াঘ্যাঁসা মুখ্য ধর্ম্মগুলির চতুর্দ্দিকে মন্ত্রপূত গণ্ডির ঘের দিয়া সেগুলিকে নির্ব্বাণের আক্রমণ হইতে সাবধানে আগ্‌লিয়া রাখা হইয়াছে।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ-সম্বন্ধে গীতাকার মহর্ষিদেবের মর্ম্মগত অভিপ্রায় যে কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে তিনটি বিষয় পরে পরে দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

আত্মার এই যে তিনটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম—জ্ঞান, আনন্দ এবং বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা বা কুশলেচ্ছা, এ তিনটির অপরিপক্ক অবস্থায় তিনটিই স্ব স্ব বিপরীত ধর্ম্মের সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়ানো থাকে; জ্ঞান—সংশয় এবং কুসংস্কারের সহিত জড়ানো থাকে, আনন্দ—বিষয়তৃষ্ণার সহিত জড়ানো থাকে, কুশলেচ্ছা—হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তির সহিত জড়ানো থাকে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

সাধকের আত্মপ্রভাবে জ্ঞানের সংস্রব হইতে সংশয় এবং কুসংস্কার অপসারিত হইলে, ঈশ্বরপ্রসাদে সেই জায়গায় ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়; আত্মপ্রভাবে আনন্দের সংস্রব হইতে বিষয় তৃষ্ণা অপসারিত হইলে, ঈশ্বরপ্রসাদে সেই জায়গায় সুবিমল সদানন্দ (সংক্ষেপে—ব্রহ্মানন্দ) আবির্ভূত হয়; আত্মপ্রভাবে কুশলেচ্ছা হইতে হিংসা-দ্বেষাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকল অপসারিত হইলে, ঈশ্বর প্রসাদে সেই জায়গায় মঙ্গলকামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা আবির্ভূত হয়।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

এইরূপ ঈশ্বরপ্রসাদ-লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মানন্দ এবং মঙ্গলপরায়ণতার ত্রিবেণীসঙ্গম জীবন্মুক্তিরও যেমন, আর, ব্রহ্মনির্ব্বাণেরও তেমনি, উভয়েরই সার-সর্ব্বস্ব।

উপরি উদ্ধৃত গীতার শ্লোকগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিয়া আমি যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই-য়াছি তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলিলাম। মন্দ নহে রহস্য! তুমি যেখানে দেখিতেছ নির্ব্বাণের নৈশ অন্ধকার, আমি সেখানে দেখিতেছি আত্মজ্ঞানের সূর্য্যালোক।

প্রশ্ন॥ একটা কিন্তু তুমি দেখিতেছ না—এটা দেখি-তেছ না যে, সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি; আর, সেইজন্য ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত তিন গুণের কোনোটিরই কোনো ধর্ম্ম মুক্তির ত্রিসীমার মধ্যে প্রবেশ পাইতে পারে না;—রজোগুণের এই যে-দুইটি ধর্ম্ম—দুঃখ এবং অশান্তি, আর, তমোগুণের এই যে-দুইটি ধর্ম্ম—জড়তা এবং মোহ, এ তো প্রবেশ পাইতে পারেই না; তা ছাড়া, সত্ত্বগুণেরও কোনো ধর্ম্ম মুক্তিরাজ্যে প্রবেশ পাইতে পারে না; সুখ ও প্রবেশ পাইতে পারে না—জ্ঞানও প্রবেশ পাইতে পারে না। শাস্ত্রকার মহর্ষিদেব স্বয়ং কি বলিতেছেন? বলিতেছেন তিনি—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিন মব্যয়ং॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥"

ইহার অর্থ এই:—

প্রকৃতি সম্ভূত এই যে তিনটি গুণ—সত্ত্ব রজ তম, তিনটিই অব্যয় আত্মাকে দেহে বাঁধিয়া রাখে। তাহার মধ্যে যেটি স্বীয় নির্ম্মল স্বভাবের গুণে প্রকাশক এবং সুখাত্মক সেই প্রথম গুণটি, কিনা সত্ত্বগুণ, আত্মাকে সুখের আর জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে।

এই যে বলা হইয়াছে "সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখের আর জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে" ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, সুখই বা কি, আর জ্ঞানই বা

কি, দুইই আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল; আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, ও দুইটির কোনোটিই মুক্তির ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারে না।

উত্তর॥ চর্ম্মচক্ষু মেলিয়া গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এটা যেমন তুমি দেখিয়াছ যে, সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখের আর জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে; জ্ঞানচক্ষু মেলিয়া এটাও তেমনি তোমার দেখা উচিত যে, সে যে সত্ত্বগুণ—তাহা ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব বই ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমূল প্রদেশের শুদ্ধসত্ত্ব নহে। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ বড় যে কম তাহা নহে;—ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমূল-প্রদেশের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ একেবারেই রজস্তমোগুণের সঙ্গবর্জ্জিত; পক্ষান্তরে, ত্রিগুণের কোটার ভিতর অঞ্চলের মিশ্রসত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের সহিত মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট। এখানে পাঁচটি বিষয় দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্ম দুইটি—সুখ এবং জ্ঞান।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

রজস্তমোগুণের সঙ্গবর্জ্জিত শুদ্ধ সত্ত্বের বা অমিশ্র সত্ত্বগুণের মুখ্যধর্ম্মও দুইটি (১) অমিশ্র জ্ঞান কিনা অজ্ঞান এবং জড়তার সঙ্গবর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞান, :অথবা যাহা একই কথা—অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান; এবং (২) অমিশ্র সুখ কিনা দুঃখ এবং অশান্তির সঙ্গবর্জ্জিত সুবিমল আনন্দ, সংক্ষেপে—ব্রহ্মানন্দ।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

রজস্তমোগুণের সম্প্লিষ্ট মিশ্রসত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্মও দুইটি—(১) মিশ্রজ্ঞান কিনা অজ্ঞান এবং জড়তার সম্প্লিষ্ট বিষয়-জ্ঞান বা বিষয়-বুদ্ধি, (২) মিশ্রসুখ কিনা দুঃখ এবং অশান্তির সম্প্লিষ্ট বিষয়সুখ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

সকল শাস্ত্রেই বলে যে, মিশ্রসত্ত্বগুণের এই যে দুইটি ধর্ম্ম—(১) বিষয়জ্ঞান বা স্বার্থপরায়ণ কর্তৃত্বাভিমানী বিষয়-বুদ্ধি, এবং (২) অনিত্য বিষয়-সুখ, এ দুইটি মিশ্র সাত্বিক ধর্ম্ম আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল তাহাতে আর ভুল নাই; তবে কিনা উহা রাজসিক পাপপ্রবৃত্তি এবং তামসিক জড়তার ন্যায় মারাত্মক-গোচের বন্ধনশৃঙ্খল নহে। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, দ্বেষহিংসাময়ী রাজসিক পাপপ্রবৃত্তি নাগপাশের বন্ধন; অজ্ঞানময়ী তামসিক জড়তা লৌহশৃঙ্খল; আর, মিশ্রসত্ত্বের ঐ যে দুইটি ধর্ম্ম—বিষয়বুদ্ধি এবং বিষয়সুখ, উহা স্বর্ণশৃঙ্খল। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের এই যে দুইটি ধর্ম্ম—(১) অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান এবং (২) সুবিমল সদানন্দ, এ দুইটি বিশুদ্ধ সাত্বিক ধর্ম্ম আত্মার বন্ধনশৃঙ্খল হওয়া দূরে থাকুক—ইহা মুক্তির নিদান।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

দৃশ্যমান জগতে বিশুদ্ধ জল কুত্রাপি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গঙ্গার জল ন্যূনাধিক পরিমাণে গৈরিক মৃত্তিকা মিশ্রিত, সমুদ্রের জল লবণাক্ত, সরোবরের জল হংসাদি জলচর জন্তুর মলমূত্রে ন্যূনাধিক পরিমাণে কলুষিত, এমন কি জলীয় বাষ্পও বিভিন্নজাতীয় নানাপ্রকার বাষ্পের সহিত মাখামাখিভাবে সংশ্লিষ্ট। দর্শনবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দৃশ্যমান জগতের চতুঃসীমার মধ্যে জলমাত্রই যেমন মিশ্রধর্ম্মী, ত্রিগুণের কোটার চতুঃসীমার মধ্যে সত্ত্বগুণ মাত্রই তেমনি মিশ্রসত্ত্ব। কিন্তু তা বলিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, বিশুদ্ধ জল বলিয়া একটা পদার্থ মূলেই নাই, অথবা শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া একটা পদার্থ মূলেই নাই; তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। তাঁহার জানা উচিত যে, দৃশ্যমান জগতে যেখানে যতপ্রকার জল আছে—বিশুদ্ধ জল তাহাদের সকলেরই মূল উপাদান;—ত্রিগুণের কোটার ভিতরে যেখানে যত সত্ত্বগুণ আছে—সমস্তেরই মূল উপাদান শুদ্ধসত্ত্ব। অতএব এ কথা যেমন সত্য যে, ত্রিগুণের কোটার ভিতর অঞ্চলে মিশ্রসত্ত্ব বই শুদ্ধসত্ত্ব স্থান পাইতে পারে না; এ কথাও তেমনি সত্য যে, ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমূল-প্রদেশে শুদ্ধসত্ত্ব চিরবর্ত্তমান। এখন দেখিতে হইবে এই যে, সকলেই জানে গঙ্গাজল মাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে ঘোলা জল, কেন না ঝর্ঝরে পরিষ্কার গঙ্গাজলেও একটু আধটু গৈরিকমৃত্তিকা মিশ্রিত আছেই আছে; অথচ বিচারালয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য-দান করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিচারপতি তাঁহাকে শুধুকেবল বলেন "গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সত্য কথা বলো", তাবই, এরূপ বলেন না যে, "ঘোলা গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সত্য কথা বলো।" তেমনি, আমাদের দেশের পণ্ডিত মহলে একথা না জানে এমন লোকই নাই যে, ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগুণ মাত্রই মিশ্রসত্ত্ব; অথচ, গীতাকার মহর্ষি শুধু কেবল বলিলেন যে, "ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখ আর জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে"। অনায়াসে তিনি বলিতে পারিতেন যে, "ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব আত্মাকে বিষয় সুখ আর বিষয় বুদ্ধির সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে" কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। কেন তিনি তাহা বলেন নাই? কেন যে, তিনি তাহা বলেন নাই, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। শ্রাবণ মাসে গঙ্গায় ঢল নাবিয়া সারা গঙ্গা যখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন "গঙ্গাজলে স্নান করিলাম" বলিলেই যেমন ঘোলা গঙ্গাজলে স্নান করিলাম" ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না; তেমনি, "ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগুণ" বলিলেই

মিশ্রসত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না, সুতরাং তাহাকে মিশ্রসত্ত্ব বলা নিতান্তই বাড়া'র ভাগ বিবেচনায়—গীতাকার মহর্ষি উঁহাকে শুধু কেবল সত্ত্বগুণ মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সত্ত্বগুণ যেখানে মিশ্রসত্ত্ব বই শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে পারে না, সাত্ত্বিক জ্ঞান এবং সাত্ত্বিক সুখ যে, সেখানে, মিশ্র জ্ঞান এবং মিশ্র সুখ হইবে, অথবা, যাহা একই কথা—বিষয় বুদ্ধি এবং বিষয় সুখ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহা তো হইবারই কথা। এখন বক্তব্য এই যে, ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভূক্ত মিশ্রসত্ত্ব যেমন আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল, তেমনি মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্মদুটাও আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল ;—বিষয় বুদ্ধিও যেমন, বিষয় সুখও তেমনি, দুইই আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল। কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্ব তো আর ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভূক্ত মিশ্রসত্ত্ব নহে। শুদ্ধ সত্ত্ব ত্রিগুণের কোটার সীমা ছাড়াইয়া তাহার ভিত্তিমূল প্রদেশে অবস্থান করে—ইহা আমরা একটু পূর্ব্বে দেখিয়াছি। অতএব এটা স্থির যে, পদ্মপত্র যেমন জলবিন্দুর আধার হইয়াও জলবিন্দু কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হয় না ; শুদ্ধসত্ত্ব তেমনি ত্রিগুণের মূলাধার হইয়াও ত্রিগুণ দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রে শুধু বলে এই যে, ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভূক্ত সত্ত্বরজস্তমোগুণ আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল ; তা বই, এ কথা বলে না যে, ত্রিগুণের কোটার ভিত্তি মূলপ্রদেশের শুদ্ধ সত্ত্বআত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল। পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ বেদান্ত-পুস্তকের গ্রন্থকার কি বলিতেছেন শ্রবণ কর :—

"চিদানন্দময়:ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা
তমোরজঃ সত্ত্ব গুণা প্রকৃতিঃ ; দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্ব শুদ্ধ্য বিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে॥
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাংস্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশ গস্ত্বন্য : (অর্থাৎ জীবাত্মা)॥"

ইহার অর্থ এই :—

চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমন্বিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দুই প্রকার—

(১) শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রকৃতি—যাহার আরেক নাম মায়া, আর, (২) মলিন সত্ত্বময়ী প্রকৃতি—যাহার আর এক নাম অবিদ্যা। সেই যে শুদ্ধ সত্ত্বময়ী প্রকৃতি—মায়া, তিনি আপনার অধিষ্ঠাতা-পুরুষের বশবর্ত্তিনী। তাঁহার অধিষ্ঠাতা-পুরুষ কে? না সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। আর, এই যে মলিন সত্ত্বময়ী প্রকৃতি—অবিদ্যা, ইনি আপনার অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অধীনতা-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখেন। ইঁহার অধিষ্ঠাতা কে? না জীবাত্মা।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতে মলিন-সত্ত্বই (অর্থাৎ ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব) স্বীয় অধিষ্ঠাতা'র (কিনা জীবাত্মার) বন্ধন-শৃঙ্খল ; তা বই, শুদ্ধ সত্ত্ব (অর্থৎ ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমূল-প্রদেশের খাঁটি সত্ত্বগুণ) স্বীয় অধিষ্ঠাতার (কিনা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মার) বন্ধন শৃঙ্খল হওয়া দূরে থাকুক, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মার বশবর্ত্তী।

অতএব এটা স্থির যে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতে শুদ্ধসত্ত্ব আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল নহে ; আর তাহা হইতেই আসিতেছে যে, শুদ্ধ সত্ত্বের এই যে দুইটি মুখ্য ধর্ম্ম—অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান এবং সুবিমল সদানন্দ, এ দুইটির কোনটিই আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল নহে।

প্রশ্ন॥ শুদ্ধ সত্ত্বেরই বা পরিচয়লক্ষণ কি, আর, মিশ্র সত্ত্বেরই বা পরিচয় লক্ষণ কি?

উত্তর॥ আমি অনতিপূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে,

(১) সত্ত্বগুণের মুখ্যধর্ম্ম দুইটি—

(১) জ্ঞান এবং (২) সুখ। মিশ্রসত্ত্বের মুখ্য ধর্ম্ম ও দুইটি—[১] বিষয়-বুদ্ধি এবং [২] বিষয় সুখ। শুদ্ধ সত্ত্বের মুখ্য-ধর্ম্মও দুইটি—[১] অপরোক্ষ আত্মানুভূতি এবং [২] সুবিমল সদানন্দ।

প্রশ্ন॥ তোমার যাহা মন্তব্য কথা তাহাই তুমি পূর্ব্বেও বলিয়াছ—এখনও বলিতেছ। কিন্তু শাস্ত্রে কি বলে?

উত্তর॥ শাস্ত্রেও তাহাই বলে। সত্য কি মিথ্যা—তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন তাহা তোমাকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, তাহা হইলেই তোমার মনের সমস্ত ধন্দ মিটিয়া যাইবে।

শুদ্ধ সত্ত্বের তিনি লক্ষণ-নির্দ্দেশ করিতেছেন এইরূপ :—

"বিশুদ্ধ সত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা
যয়া সদানন্দ রসং সমৃচ্ছতি॥"

[বিবেক চূড়ামণি ১২১ শ্লোক]

ইহার অর্থ এই :—

বিশুদ্ধ সত্ত্বের ধর্ম্ম এই গুলি ;—প্রসাদ (কিনা প্রসন্নতা), আত্মানুভূতি, পরমা প্রশান্তি, তৃপ্তি, পুলক, আর পরমাত্মাতে তেমিতর নিষ্ঠা যাহাতে করিয়া সদানন্দের উৎস খুলিয়া যায়।

এই শ্লোকটির মধ্য হইতে সার সঙ্কলন করিয়া পাইতেছি এই যে, শুদ্ধ সত্ত্বের ধর্ম্ম প্রধানতঃ দুইটি—[১] অপরোক্ষ আত্মানুভূতি বা আত্মজ্ঞান এবং [২] পরমাত্মাতে স্থিতিজনিত সদানন্দ।

মিশ্রসত্ত্বের তিনি পরিচয়-জ্ঞাপন করিতেছেন এইরূপ :—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি
তাভ্যাং * মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ং॥
মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ
স্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তি রসন্নিবৃত্তিঃ॥"

[বিবেক চূড়ামণি ১১৯।১২০ শ্লোক]

ইহার অর্থ এই :—

সত্ত্বগুণ যদি চ জলের ন্যায় নির্ম্মল-স্বভাব তথাপি অপর-দুটার সহিত (অর্থাৎ রজস্তমোগুণের সহিত) মিলিয়া বন্ধনের হেতুভূত হয়। এইরকমের সত্ত্বগুণে (অর্থাৎ রজস্তমোগুণের সন্বাশ্লিষ্ট মিশ্র সত্ত্বগুণে) আত্মা প্রতিবিম্বিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় নিখিল জড়বস্তু প্রকাশ করে। ☞ [ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, জড়প্রকাশক বহির্মুখী বিষয়জ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ আত্মানুভূতি মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্ম নহে। অপরোক্ষ আত্মানুভূতি যে, শুদ্ধসত্ত্বেরই ধর্ম্ম তাহা অনতিপূর্ব্বে বিবেক চূড়ামণি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে।] মিশ্র সত্ত্বের লক্ষণ এইগুলি :—স্বমানিতা (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানিতা), যমনিয়মাদি ব্রতপরায়ণতা, শ্রদ্ধাভক্তি, মুমুক্ষুতা (অর্থাৎ মুক্তির অভিলাষিতা), দৈবী সম্পত্তি (অর্থাৎ শমদমাদি সাধন সম্পত্তি), অসন্নিবৃত্তি [অর্থাৎ অসৎ পদার্থ হইতে কিনা অনিত্য বস্তু হইতে সরিয়া দাঁড়ানো]।

ইহার টীকা।

উদ্ধৃত শ্লোক দুইটির প্রথমটির প্রথমার্দ্ধ হইতে পাইতেছি যে, রজস্তমোগুণের সন্বাশ্লিষ্ট মিশ্রসত্ত্বগুণ আত্মায় একপ্রকার বন্ধন শৃঙ্খল। আবার ঐ প্রথম শ্লোকটির শেষার্দ্ধ হইতে পাইতেছি যে, আত্মজ্ঞানের প্রতিবিম্বরূপী বিষয়জ্ঞান ভিন্ন সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্ম নহে। (অপরোক্ষ আত্মানুভূতি যে শুদ্ধ সত্ত্বের ধর্ম্ম তাহা একটু পূর্ব্বে বিবেক চূড়ামণি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে)। উদ্ধৃত শ্লোকদুইটির দ্বিতীয়টির মধ্য হইতে পাইতেছি—যে, মিশ্রসত্ত্বগুণের লক্ষণ গুলির সব কটাই মুমুক্ষু সাধকের সাধনাবস্থার লক্ষণ, তা বই, তাহার একটিও মুক্ত পুরুষের সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ নহে। মিশ্রসত্ত্বের লক্ষণগুলির গোড়ার বৃত্তান্ত এইরূপ :—মিশ্রসত্ত্বের অবয়বীভূত বহির্মুখী জ্ঞানে একদিকে যেমন ভোগ্যবিষয় সকল প্রকাশ পায়, আর একদিকে তেমনি কোনো-না-কোনো ঘটনা গতিকে ভোগ্যবিষয় সকলের অনিত্যতা-দোষ সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইয়া পড়ে; আর, তাহা যখন হয়, তখন দ্রষ্টা পুরুষ অসতের প্রতি (অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর প্রতি) বীতরাগ হ'ন। মিশ্রসত্ত্বের একটি লক্ষণ তাই অসন্নিবৃত্তি। অসতের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিলেই মুক্তির অভিলাষ জাগিয়া ওঠে; মিশ্রসত্ত্বের আর একটি লক্ষণ তাই মুমুক্ষুতা। মুক্তিকামনা জাগিয়া উঠিলে মুক্তির পথপ্রদর্শক সদ্‌গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে; মিশ্রসত্ত্বের তৃতীয় আর একটি লক্ষণ তাই শ্রদ্ধাভক্তি। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জন্মিলে গুরূপদিষ্ট সাধনের পথে মতিগতি হয়; মিশ্রসত্ত্বের চতুর্থ আর একটি লক্ষণ তাই শমদমাদি এবং যমনিয়মাদির সাধন। সাধক যতদিন পর্য্যন্ত সাধনের ঢেউ কাটিয়া সিদ্ধির কূলে উপনীত না হ'ন, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির গলা জড়াইয়া ধরিয়া থাকে—কিছুতেই তাহাকে ছাড়ানো যায় না; মিশ্রসত্ত্বের পঞ্চম আর একটি লক্ষণ তাই কর্ত্তৃত্বাভিমান। পরিশেষে সাধক যখন মিশ্রসত্ত্বের স্বর্ণশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বের মুক্ত আকাশে সমুত্থান করেন, তখন তিনি ত্রিগুণের কোটার সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়া গুণাতীত হন এবং অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান, সদানন্দ এবং পরমা শান্তি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হ'ন। পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, বৃদ্ধরাজার দেহত্যাগ হইলে যুবরাজের যৌবরাজ্য যেমন আপনা হইতেই রাজার রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগ হইলে, জীবন্মুক্তি আপনা হইতেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ পদে অধিরূঢ় হয়। বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে পারত্রিক মুক্তি যে কিরূপ এবং কতরূপ—আগামী অধিবেশনে তাহার গবেষণায় বিধিমতে প্রবৃত্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* এই শ্লোকটির অব্যবহিত পূর্ব্বের গোটাছয়েক শ্লোকে রজস্তমোগুণের পরিচয় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অতএব এখানে "তাভ্যাং"—রজস্তমোভ্যাং তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

"মিষ্টিসিজ্‌ম্‌" নামক গ্রন্থ পাঠান্তে।

(১)

মানুষ যখন জলের তৃষ্ণায় কাতর, তখন যদি তাহার সম্মুখে একটা ঝরণার ছবি আনিয়া দেওয়া যায়, আর সে ছবিতে দেখে, পাহাড়ের গা বাহিয়া বনের অন্ধকারের স্নিগ্ধতা ও শান্তিমাখা শীতল ধারা কেমন কুল কুল করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, তবে কি তাহার তৃষ্ণা দূর হয়? ঝরণার ছবি যতই নেত্রহর হোক্, তৃষ্ণার সময় যে কোন বাপী বা জলাশয় হইতে গণ্ডূষ পরিমাণ জল পাইলেও তৃষ্ণার আরাম। তখন ছবি দিয়া কি হইবে?

অথচ যে সত্যে ভর করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে, আমরা সবাই আছি, সেই সকলের চেয়ে বড় সত্য সম্বন্ধে মানুষ কি অনেক সময়ে ঠিক্ এম্নিতর অদ্ভুত আচরণ করে নাই? সত্যকে যে তাহার চাইই চাই, একথা ভুলিয়া গিয়া সত্যের চমৎকার ছবি আঁকিয়া সে উপস্থিত করে। সত্য অদ্বৈত, কি দ্বৈত, কি দ্বৈতাদ্বৈত, তাহা লইয়া তাহার কত রকমের ব্যাখ্যাচাতুর্য্য, যুক্তিতর্কের জাল, শব্দের যাদু! শেষকালে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া অনেককেই পৌঁছাইতে হয়, যে সত্য আমাদের ধারণার অতীত—তাহাকে ধরিবার ছুঁইবার কোন উপায় নাই। আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি, সে আপেক্ষিক সত্য মাত্র—অর্থাৎ কিছু না কিছুর উপর তাহার অপেক্ষা আছে, একটা জিনিস বুঝি আর একটা জিনিবের সাহায্যে—কিন্তু নিরপেক্ষ পূর্ণ সত্য যে কি তাহা আমরা কোন মতেই উপলব্ধি করিতে পারি না। সেইজন্য সে একটা তত্ত্বকথা অর্থাৎ কথার কথা মাত্র হইয়া থাকে।

একজন খৃষ্টীয় সাধু বলিয়াছিলেন "প্লেটো মানুষের আত্মার স্থানটি মস্তকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আর খৃষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন হৃদয়ে।" কথাটা খুবই খাঁটি। সত্য শুধু অনুসন্ধান করিবার শুধু জানিবার বিষয়, কিন্তু পাইবার বিষয় নয়—সে জলের ছবি, পিপাসার বারি নয়—এ কথা বলিলে মানুষের আত্মাকে প্রাণে বধ করা হয়। কারণ আত্মার প্রধান অবলম্বনই সত্য—সে যে তাহার ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জলের মত।

একটা খাঁচা আছে, তাহার চারিদিকেই লোহার শিক্। কাঠবিড়ালী তাহার উপরে একবার উঠিতেছে, নীচে একবার নামিতেছে ও চতুর্দ্দিক একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে। তাহার মনে মনে হইতেছে যে সে যেন ফী বারেই নূতন কিছু আবিষ্কার করিল—নূতন পথ—নূতন দিক্—নূতন রহস্য! কিন্তু যে বাহির হইতে দেখিতেছে, সে দেখে যে সে একই জায়গায় ঘুরিতেছে।

তত্ত্বের ক্ষেত্রেও মানুষের অবস্থা এই কাঠবিড়ালীর মত। সে শিকের উপরটাকে এক নাম দিয়াছে, নীচটাকে আর এক নাম দিয়াছে, বেড়টাকে আর এক নাম দিয়াছে। কিন্তু সে যে তত্ত্বের খাঁচায় বসিয়া কথার শিকের উপরেই আনাগোনা করিতেছে, সত্যকে সে যে বাস্তবিকই পায় নাই, এ কথা তাহার আদৌ মনে আসে না!

অথচ পৃথিবীতে বহু প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সকল মানুষই এই কাঠবিড়ালীর পন্থা অবলম্বন করে নাই। সত্যকে পাইবার, সত্যের সঙ্গে একাত্ম ও অভিন্ন হইবার জন্য কত সাধনা কত উপায় কত অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান মানুষ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ইতিহাস তত্ত্বের ইতিহাসের চেয়ে কোন অংশেই সামান্য নয়। কিন্তু তাহার ইতিহাস এত বৈচিত্র্যময় যে নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া তুলিয়া তাহাকে দেখানো এক মহা কঠিন ব্যাপার! কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার কলার মধ্যে, ইন্দ্রজাল ও যাদুবিদ্যায়, ধ্যান ধারণা, সমাধি, স্বপ্ন প্রভৃতি যোগাভ্যাসে, ভক্তিসাধনার স্বেদ কম্প, মূর্চ্ছা, পুলক, বেদনা প্রভৃতি নানাবিচিত্র রসভাবে ও রসানুভূতিতে, মানুষের সকল অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার তথ্য জড়ো করিলে ও তাহার ভিতরকার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলে তবে যদি সেই ইতিহাস কিয়ৎপরিমাণে রচনা করা যায়! পৃথিবীর তাত্ত্বিকগণের পাশাপাশি পৃথিবীর ভাবুক, কবি, ঋষি, যোগী ও সর্ব্বপ্রকারের অদৃশ্যলোকবিহারিগণের বাণীকে দাঁড় করাইলে জ্ঞানগত তত্ত্ব ও উপলব্ধিগত তত্ত্ব এই দুই তত্ত্বের পার্থক্য সম্যক্ অনুভূত হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু এই কার্য্যে বহুদিন পর্য্যন্ত কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় নাই। তাহার কারণ এইদিক্ দিয়া সত্য নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ। জ্ঞান কিনা যুক্তির সরল রেখা ধরিয়া চলে, সুতরাং তাহার যুক্তি ভুলপথে গেলেও এবং গলিঘুঁজির মধ্যে ঘুরিয়া মরিলেও লোকে এ সন্দেহই করে না, যে সে মিথ্যার মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছে। সে সত্যকেই জানিতে চায়—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। তবে জ্ঞান যখন ভুল করে, তখন লোকে তাহাকে অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্ত বলে—অসৎ বা দুষ্ট কদাপি বলে না। কিন্তু এই সকল অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার রাজ্যে মানুষের পদে পদে মোহ ঘটিবার সম্ভাবনা—এখানে জ্ঞানের বাতি আলো দেয় না বলিয়া বিপথে শুধু ঘুরিয়া বেড়ানো নয়, প্রতি পদক্ষেপে হুঁচট্ খাইয়া গড়াইয়া নীচে পড়িবার সম্ভাবনা। এখানে ছলনার স্থান অত্যন্ত অধিক—এখানে মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া চিনিতে

অনেক বিলম্ব ঘটে। অতএব জ্ঞানের রাজ্যের ভুলের চেয়ে এখানকার ফাঁদের মধ্যে আটকানোকে সকল লোকেই বেশি করিয়া ডরায়। ইন্দ্রিয়ের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি মানুষের বাস্তবিকই ঘটে কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া চিরকাল মানুষ কিছুই পাইবে না ও উপলব্ধি করিবে না, কেবল এক পরিপূর্ণ অতীন্দ্রিয় সত্য আছেন মাত্র এই কথা যুক্তিতর্ক করিয়া প্রমাণ করিবে মাত্র,—ইহাতো হয় না। কারণ পাইতেই হইবে। আর পাইতে গেলেই যাহারা টাটুকাটাটুকি উপলব্ধি করিয়াছে তাহাদের শরণ লওয়া ভিন্ন আর কি উপায় আছে? বস্তুবিজ্ঞানকে যেমন করিয়া মানুষের নানা সংস্কারকে ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া কার্য্যকারণের সম্বন্ধকে যথাযথরূপে সকল বস্তুর মধ্যে দেখাইতে হয়—সেইরূপ সময় আসিয়াছে, যখন অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রস্তুত হইবে, যখন এ সকল ব্যাপারেও যাহা স্থূল সংস্কার তাহাকে অপসারিত করিয়া যথার্থ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইবে। আমারতো খুব বিশ্বাস, ভবিষ্যতে মানুষকে এই কাজে লাগিতে হইবে। আর এখন হইতেই তাহার সূচনা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

(২)

এ কথা কেন বলিতেছি তাহা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া দেখা যাক্‌। আমরা এ পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে, কাব্যকলা, ধ্যান, যোগ, ভক্তি ও রসের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি ব্যাপারকে আগাগোড়া কাল্পনিক ও অনুভূতিগত অর্থাৎ জ্ঞান যুক্তি ও বাস্তবিকতা-বর্জ্জিত বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি। মানুষের মনস্তত্ত্বকে আমরা গোটাকতক মোটা ভাগে বিভক্ত করিয়া ভাবিয়াছি যে সে ভাগগুলি বুঝি একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট—চক্‌ কাটা সতরঞ্চের মত তাহার আর একটার সঙ্গে অন্যটার মিলিবার কোন রাস্তা নাই। একটা ভাগের নাম বুদ্ধি—তাহাতে ইন্দ্রিয়বোধ, কল্পনা, স্মৃতি ও যুক্তি আছে—একটার নাম অনুভূতি—ও আর একটার নাম ইচ্ছা বা ক্রিয়াশক্তি—ইত্যাদি। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত হইলেও তাহাদেরও মধ্যে যে অদ্ভুত ঐক্য ও সাহচর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়—মানস রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির মধ্যে পরস্পরের অচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেইটুকু পরিমাণও দেখিতে না পাইবার জন্য আমরা কল্পনা ও অনুভূতি প্রভৃতি ব্যাপারের নানা অত্যাশ্চর্য্য লীলা দেখিয়াও তাহাদিগকে সত্যনির্দ্ধারণের সহায় বলিয়া গণ্য করি নাই।

কিন্তু মনস্তত্ত্ব তো আর চুপ করিয়া একজায়গায় বসিয়া থাকিতে পারে না—সে যখন বিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য হইবে তখন অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় নানা প্রমাণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া তাহাকেও অগ্রসর হইতে হইবে। হঠাৎ Subconscious বা অর্দ্ধচেতন মনের তত্ত্ব মায়ার্স সাহেব উপস্থিত করিয়া আমাদের চৈতন্য সম্বন্ধে সংস্কারের দুর্গ এক মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন। চেতনা যেটুকু জানি তাহার চেয়ে অনেক বড় চেতনাকেই জানি না! অথচ সেই অজানা সেই স্মৃতির নিম্নতলবাসী স্বপ্নাভাসময় চেতনাকে লইয়া শরীরের ক্ষেত্রে ও মনের অনুভূতি ও কল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের কত কারবার চলিয়াছে! আমাদের ভিতরের পশু এবং দেবতা সেইখানে পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে! কত যুগের কত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের সকল সংস্কার সেইখানে গোপন ভাণ্ডারের মধ্যে বদ্ধ হইয়া নানা আভাসে ইঙ্গিতে ক্রমাগতই বাহিরে আসিবার জন্য চেতনার পর্দ্দার প্রান্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। আমাদের মনের যে সকল অনুভূতি হঠাৎ আসে যায়, যাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অহেতুক বলিয়া বোধ হয় অথচ যাহাদের ছাপ মনের উপর প্রবল এবং যাহাদের প্রেরণায় মানুষ কত কলাসৃষ্টি করিতেছে, কত অদ্ভুত হাসিকান্নায় আন্দোলিত হইতেছে,—তাহাদের এই লীলার আরতো কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে সমস্তই সেই মগ্ন চেতনালোকের উৎক্ষিপ্ত ছায়ারূপীদিগের কাণ্ড! এত বড় একটা ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ-জড়ানো মনের রাজ্য এত বড় একটা শততল সহস্রতল গোপনভবন হঠাৎ চোখের সামনে উপস্থিত হইবার মত আশ্চর্য্য বস্তু কি আর কিছুই থাকিতে পারে! আমাদের এই চেতনার ব্যাপারটা যেন একটা বাঁশির মত—ছিদ্রগুলো আমাদের কাছে সুস্পষ্ট গোচর এবং আমরা যে তাহাতে ফুৎকার দিই তাহাও দেখিতে পাই—কিন্তু সমস্ত আকাশের বায়ুস্তরের সঙ্গীত যে কেমন করিয়া তাহাতে কখন আসিয়া মিলিয়া যায় তাহা কি আমরা জানি! জাগ্রৎ চেতনা ও সুপ্ত চেতনা যখন সেই ভাবে মেলে, তখনই তো আমরা সৃষ্টি করি, পাগলামি করি, ইন্দ্রিয়ের পর্দ্দা তুলিয়া অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্যমণ্ডপে যুগযুগান্তের ছায়াভিনয় দেখি! সুতরাং এ সকল ব্যাপারকে পূর্ব্বেকার মত কেবল কল্পনা, কেবল অনুভূতি এবং সত্য নহে—এ কথা আর বলা চলে না। চেতনা সকল সময়ে সকল অবস্থায় না হোক—কোন কোন সময়ে কোন কোন অবস্থায় অখণ্ডভাবে কাজ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে এ সকল কথা বহুপূর্ব্বেই যোগশাস্ত্র এবং ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণের নিকটে সুবিদিত ছিল। যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তিনিরোধ, শমদমাদির সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়কে ক্রমাগত বহির্বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ হইতে না দিবার

অর্থহ, সেই গভীরচেতন স্বযুপ্তিলোকের মধ্যে অভিলীন হইয়া সেই গুহাহিতগহ্বরেষ্ঠকে সেই হিরণ্ময়কোষে বিরাজিত নিষ্কল শুভ্রস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়াস। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সাধনার ও সেই লক্ষ্য। এই জন্য মন্ত্রের শক্তির এরূপ আশ্চর্য্য প্রভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার ভক্তিশাস্ত্রে, নামজপ, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি ভজনের দ্বারা সেই একই উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সেও ইন্দ্রিয়ের এলাকার বাহিরে যাইবার চেষ্টা—দশদিকে বিভ্রান্ত মনকে কুড়াইয়া একমুখীন করিবার চেষ্টা। রূপ ও বিগ্রহ ধ্যানের মধ্যেও সেই চেষ্টাই আর একভাবে দেখা দিয়াছে। ইউরোপে মধ্যযুগে যখন এখনকার মত বিজ্ঞান সর্ব্বগ্রাসী হইয়া আর আর সকল সাধনাকে বিলুপ্ত করিয়া দেয় নাই—যখন অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির জন্য মানুষের প্রাণে আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সেই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ নানা অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু বিস্ময়কর গুহ্য সাধনার সৃষ্টি সেখানেও হইয়াছে। আর সে সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের দেশের যোগসাধনা ও ভক্তিসাধনার নানা পন্থার ও প্রণালীর অনেক সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। যেমন ধর, হিউ অব্ সেণ্টভিকৃটর, মাদাম গুঁয়ো, জেকব বইমে প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের যোগপন্থিগণের ও মেচ্‌থিল্ড অব্ ম্যাগ্‌ডিবার্গ, সেণ্টটেরেসা, জুলিয়ান অব্ নরউইচ্ ও রিচার্ডরোলে প্রভৃতিদের সঙ্গে আমাদের ভক্তিপন্থিগণের বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাধকগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারা যায়।

ইঁহারা সকলেই কি বাণীতে, কি রচনায়, কি ভাবপ্রেরণায়, ইহাই অনুভব করিয়াছেন যে ইঁহাদের সচেতন মন কোন কাজই করিতেছে না। মন যখন আপনাকে আপনি ভুলিয়াছে, যখন আপনাকে সেই গভীরতর ভাবপ্রবাহের মুখে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়াছে, তখনই ইঁহারা যে বাণী বলিয়াছেন, তাহাতে নিজেরাই কৃতার্থ হইয়াছেন, যে রচনা লিখিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্য হইয়াছে, যে প্রেরণা অনুভব করিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে ভগবানের শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। মাডামগুঁয়ো এক স্থানে লিখিয়াছেন "লিখিতে লিখিতে আমি দেখিতাম যে, যে সব জিনিস আমি কখনই দেখি নাই তাহাদের কথা লিখিয়া বসিতেছি, এবং অনুভব করিতাম যে আমার মধ্যে জ্ঞানের কত আশ্চর্য্য রত্ন রহিয়াছে, অথচ আমি তাহার কিছুই জানি না।"

"অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ"—

ইহা যে সত্য তাহার সাক্ষ্য জগতে বহু কবি ও ভাবুক, বহু ভক্ত নরনারী দান করিয়া গিয়াছেন।

(৩)

এই খানেই আমরা এমন এক ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হই, যেখানে মানুষের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পরচনা মিলিয়া যায়। তাহার কারণ, দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতে সর্ব্বদাই যে আনাগোনা চলিয়াছে! "অচিন্ পাখী" ক্রমাগতই দৃশ্য জগতের "খাঁচার মধ্যে" আসিতেছে যাইতেছে! সুতরাং দৃশ্যের পট তুলিয়া অদৃশ্য যেখানে যেমনি দেখা যাইতেছে, অমনি সেখানে মানুষ সেই পরম সত্তারই স্পর্শ লাভ করিতেছে। প্রণয়ী প্রণয়িনী যে দিন প্রথম পরস্পরের অন্তরের সোনার কাঠিটি ছুঁইয়া চিরনিদ্রার রহস্যপুরে জাগ্রত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়া যায়—সেদিন তাহারা কি সেই দৃশ্য লোকের পটখানি তুলিয়া অদৃশ্য লোকের বাসরঘরের রত্নপ্রদীপের আলো দেখিতে পায় না? প্রকৃতির মুখের উপর হইতে যে দিন অকস্মাৎ ঘোমটা খসিয়া যায়, এবং কবি দেখেন; "নাহি কাল দেশ তুমি অনিমেষ মূরতি, তুমি অচপল দামিনী"—তখন কি দৃশ্য জগৎ আর কোথাও থাকে? বাহির এবং ভিতরের মাঝখানের দেয়ালটা কি ভাঙিয়া গিয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় না? প্রেমে বল, সৌন্দর্য্যে বল,—শিল্পকলার যেগুলি প্রধান বিষয় তাহার মধ্যে এই অদৃশ্য জগতের বার্ত্তাটিই যদি না পাওয়া যায়, তবে কি তাহাদের কোন অর্থই থাকে? শিল্পসাহিত্যে যদি বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপই দেখি, তবে সে শিল্পসাহিত্য কোনদিনই আমাদের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। শিল্পসাহিত্য রহস্যকেই দেখায়—তাহার দৃষ্টিকে সেই জন্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সামিল হইতেই হইবে।

শিল্পসাহিত্যই বলি, আর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশই বলি, অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় লোকের বার্ত্তা কোন রূপক বা বিগ্রহের সাহায্য ভিন্ন কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়? সেই জন্যইতো কবিতায়, শিল্পে, ধর্ম্মে—বিগ্রহের এত স্থান। কিন্তু বিগ্রহকে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেই হয়। সুতরাং অতীন্দ্রিয় ভাবকে যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে হয়—সে এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশে বৈষ্ণব কাব্যের সেই সমস্যা—মুসলমান সুফী সাহিত্যের সেই সমস্যা—মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ভক্ত নরনারীগণের রচনার মধ্যেও সেই সমস্যা! যেমন বৈষ্ণব কাব্যে ধর,—পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া দৌত্য, অভিসার, সম্ভোগ, বিচ্ছেদ,

খণ্ডিতাবস্থা, মান প্রভৃতি প্রেমলীলার নানাবৈচিত্র্যকে ভগবৎপ্রেমের প্রতিরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা কি সহজ? অথচ ইহা সত্য যে সে ভাবে গ্রহণ করা ভিন্ন ইহাদের আর কোন সার্থকতা নাই। বৈষ্ণব কাব্য যদি পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার দেহে মনে ও বিশ্বসংসারে নিত্যপ্রেমলীলাকেই ব্যক্ত না করে, তবে লৌকিক প্রেমের দিক হইতে দেখিতে গেলে, ইহাকে সমর্থন করাই শক্ত হয়। এ বিষয়ে তো জোর করিয়া ব্যাখ্যা দ্বারা এই মত প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিনা—কারণ ইহা জানি যে, কত কত ভক্ত জীবনকে এই কাব্য বাস্তবিকই অমৃতে অভিসিঞ্চিত করিয়াছে। সেন্ট টেরেসা বা সেন্ট ক্যাথেরিণের খৃষ্টের সঙ্গে "আধ্যাত্মিক বিবাহের" রূপকও বৈষ্ণব কাব্যের রূপকেরই মত।

কাব্য বা শিল্প যখন এইরূপ রূপকের সাহায্য লয়, তখন সে যে সচেতন ভাবে এ কাজ করে এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চেতন ও অর্দ্ধচেতন সত্তা যখন মিলিয়া যায়, যখন চেতন সত্তা আপনার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় সেই সময়েই এই ধরণের শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে। সেইজন্যই ইহাদের সঙ্গে ধ্যানীদের ধ্যানের ও ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাসের মিল রহিয়াছে। এ রূপক কেমন করিয়া আসে তাহা কেহ বলিতে পারে না। যেমন জন্ম রহস্যময়—ইহাও ঠিক তেমনিই। ভাব যে আপনিই মূর্ত্তি ধারণ করে—এও যে সেই ভাবের মূর্ত্তিতে জন্মলাভ। যে কবি জন্মদান করেন তিনি কোন্ সময়ে ইহাকে ধারণ করিয়াছেন, তাহাও জানেননা—কতদিন ধরিয়া তাঁহার গোপন অর্দ্ধচেতন লোকে যে ইহার দেহ গঠিত হইয়াছে তাহাও তিনি বলিতে পারেন না। তিনি শুধু জানেন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তের পরম বেদনায় এই দেহপ্রাপ্ত ভাবশিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন পূর্ণাবয়ব হইয়াই জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু সে অবয়ব যে কবি নিজে গঠিত করিয়াছেন এ কথা কল্পনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শিল্পসাহিত্যের এই রূপক সৃষ্টি সেইজন্য আশ্চর্য্য ও রহস্যময়। আল্‌গাজ্‌জালি বলিয়াছেন "সুফীরা যে কেবল বাক্‌পটু মানুষ তাহা নহে, তাহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ।" উপনিষদ্ বলিয়াছেন ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"। একজন খৃষ্টান ভক্ত বলিয়াছেন "আমার বাণী আমি আমার প্রত্যেকটি অঙ্গে দেখিয়াছি, শুনিয়াছি এবং সকল রকমে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি আমার আত্মার চক্ষুর দ্বারা তাহা দেখিয়াছি, আমার আত্মার কর্ণের দ্বারা তাহা শ্রবণ করিয়াছি।"

এ সকল কথা নিজের রচনা সম্বন্ধে কখন্ মানুষের মুখ হইতে বাহির হইতে পারে? পরিপূর্ণ চিন্ময় রসরূপী সত্তাতে তন্ময় তদ্‌গত না হইলে কি এ কথা কেহ বলিতে পারে? তত্ত্বের সাধ্য কি সে এ কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করে! এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আবরণ উন্মোচন করিয়া যে লোক অতীন্দ্রিয় পরম সত্যের পরিচয় পাইয়াছে, সে জানিয়াছে যে তাহা শূন্য নয় কিন্তু প্রেমরসে পূর্ণ!—সেইতো মজিয়াছে এবং সেইতো আপনাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া এই কথাই বারবার বলিয়াছে "তোমার নিকট হইতে যে সকল পদার্থ আসে, আমি তাহার একটিরও অভিলাষী নহি, হে স্বামিন্ হে প্রিয়তম, আমি শুধু তোমারি অভিলাষী।"

জগতে আজ এই শ্রেণীর সাধনার ও বাণীর সকল বিচিত্র ইতিহাস জানিবার জন্য মানবের মনে আগ্রহ জন্মিয়াছে। আজ আর ঝরণার ছবি দেখিয়া তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টাকে মানুষ পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। জল চাই—জীবনকেই এমন করিয়া তোলা চাই যাহাতে সে সত্যের সঙ্গে অভিন্ন ও একাত্ম হইয়া যায়। সেইজন্য সাহিত্য ও শিল্পকলাও দেখিতেছি বাস্তবের প্রতিরূপ হইবার প্রয়াসকে আর গ্রহণ করিতেছে না। তাহারা সেই সাধনাকে আশ্রয় করিতে চাহিতেছে, যাহা যুগে যুগে ধ্যানীগণ তপস্বীগণ ভক্তগণ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া গিয়াছেন। আমরা তত্ত্বের, সাহিত্যের, শিল্পের, ধর্ম্মের এই নব পরিবর্ত্তনের যুগে বাস করিতেছি। আমাদেরও চৈতন্যকে দূরব্যাপ্ত ও সুগভীর, আনন্দময় ও সর্ব্বময় না করা পর্য্যন্ত নবযুগের এই নব সাধনা ও নববাণীকে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিব না। ইউরোপ এখন মধ্যযুগে পুনরায় প্রবেশ করিতেছে—আমাদেরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সকল রত্নরাজি এখন একত্রিত করা দরকার। তাহাদের মাহাত্ম্য যে কি আশ্চর্য্য তাহা আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। আমাদের দেশে এই অতীন্দ্রিয় রসের সাহিত্য প্রচুর। কবীর, নানক, দাদূ, রবিদাস, জ্ঞানদাস, তুকারাম প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থানের ভক্তগণ আমাদের জন্য যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন কোনদেশে এরূপ সম্পদ আছে কিনা সন্দেহ করি। আজও পর্য্যন্ত আমাদের সমাজের নিম্নস্তরে সেই স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—বাংলাদেশের বাউলের গানই তাহার প্রমাণ। আমরা তো উচ্চ শিক্ষিত সভ্য মানুষ—তেতলা দালানে বাস করি ও ইংরাজী কেতাব পড়ি—কিন্তু সমাজের নিরক্ষর চাষীদের ভিতর হইতে সময় সময় যে সকল গান বাহির হয় তাহা শুনিলে আমাদের ধনমানের বিদ্যার গৌরব এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায় নাকি?—

সমস্ত মন সেই পথের ধূলায় নামিয়া সেই গানের সঙ্গে যাত্রা করিবার জন্য কাঁদিয়া উঠে না? ইউরোপে যে ভক্তিসাহিত্য আছে তাহার চেয়েও লক্ষগুণে গভীরতর ও পূর্ণতর গীতি সাহিত্য আমাদের দেশে কত যুগ ধরিয়া ক্রমাগতই সঞ্চিত হইয়া কি এক অফুরন্ত উৎসের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! অথচ আমাদের ইংরাজী কেতাব-পড়া মাথার মধ্যে কি তাহার সুর একটুও রন্ধ্র করিয়া প্রবেশলাভ করিল? আমাদের হৃদয় কি বুঝিতে পারিয়াছে ভারতবর্ষে আমাদের যথার্থ গৌরবের সামগ্রীটা কি? বেদান্ত? তাতো বটেই—কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে আমি বলিব যে ভারতবর্ষের পরমগৌরবের জিনিস সেই বেদান্ত, যাহা জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন মায়াবাদের বেদান্ত নয়—জীবনের সঙ্গে যাহার মাথামাথি সম্বন্ধ। ঠিক ফলের সঙ্গে যেমন বীজের সম্বন্ধ। বীজরূপী সেই বেদান্ত অন্তরে—বাহিরে রসালো মায়া—সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য, মানুষের প্রীতি ও স্নেহ, ইন্দ্রিয়-মনের সহস্র বন্ধনের সুখ দুঃখ।—মায়া! মায়া! মায়া!—কিন্তু সত্যের মায়া, পরম সত্যের বাহ্য আবরণ! এ মায়া যে বধূর অবগুণ্ঠনের মত—সেই অবগুণ্ঠনখানিই তুলিয়া লইলে কি আর বধূর মনোহারিত্ব কিছু থাকে! এই যে অনন্তের সঙ্গে আর সান্তের খেলা—সত্যের সঙ্গে আর মায়ার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—এই তত্ত্বই ভক্তির দিক্ দিয়া ভারতবর্ষে প্রকাশ পাইয়াছে। যুগে যুগে এই প্রকাশই আর নিঃশেষ হইতে চাহিতেছে না। সেই উপনিষদের কাল হইতে এখনকার আধুনিক সাহিত্যের কাল পর্য্যন্ত সেই একই প্রকাশের লীলা! মনে হয় যেন কালের এত বড় ব্যবধানটা—এত প্রকাণ্ড গহ্বরটা একেবারেই মিথ্যা।—যে বাণী বহুপ্রাচীনকালে উচ্চারিত হইয়াছিল, সে যেন আজিকার বাণী!

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

একটি উপাখ্যান।

একদেশ ছিল, সে দেশে জল সহজে পাওয়া যাইত না। সকলেই জলের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিত—দুর্বৎসরে জলের সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত লোক যে জল না পাইয়া মারা যাইত তাহা বলা যায় না।

কিন্তু কয়েকজন লোক সেখানে ছিল—তাহাদের পরিশ্রম করিবার শক্তিও যেমন, বুদ্ধিবৃত্তিও তেমনই তীক্ষ্ণ ছিল। সুবিধার সময় ইহারা কিছু কিছু জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাই একবার অন্যরা যখন জল খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া ফিরিতেছিল, ইহারা তখন আরামে বসিয়াছিল।—ইহাদের নাম ছিল ক্যাপিটালিষ্ট। ইহাদের সন্ধান পাইয়া তৃষ্ণাকাতর জনসাধারণ আসিয়া ইহাদের কাছে জল ভিক্ষা করিতে লাগিল—জলাভাব তখন একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ক্যাপিটালিষ্টরা তাহাদের কথায় খুব বেশী কর্ণপাত করিল না। তাহারা বলিতে লাগিল—

"আঃ, কোথাকার নির্ব্বোধ ইহারা! যাও, যাও! আমরা কষ্ট করিয়া এই যে জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা যদি তোমাদের দি, তবে আমাদের দশাও ত তোমাদের মতই হইবে!—তোমাদের সহিত একসঙ্গে মরিবার জন্য আমাদের মনে ত খুব আগ্রহ আসিতেছে না!"—তৃষ্ণায় তাহারা তখন মৃতপ্রায়, যুক্তির সারবত্তা কিছুতেই তাহাদের মাথায় ঢুকিল না।—তাহারা কাতর-কণ্ঠে বারম্বার তাহাদের প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। অবশেষে ক্যাপিটালিষ্টরা বলিল—"আচ্ছা শোন, এককাজ যদি কর 'ত' তোমাদের জল দিতে পারি:। তোমরা সকলে আমাদের ভৃত্য হও!" সকলে আনন্দে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"তথাস্তু! জল দাও, জল! জল পাইলে আমরা এবং আমাদের সন্তান সন্ততিরা চিরদিন তোমাদের দাস হইয়া থাকিব!" সেদিন হইতে তাহারা ক্যাপিটালিষ্ট-দের ভৃত্য হইল।

ক্যাপিটালিষ্টরা নির্ব্বোধ ছিল না—বস্তুত সে যুগে তাহাদের মত চতুরলোক দেখা যাইত না। তাহারা স্বদেশবাসীদের কয়েকজনকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া অন্যদের তাহাদের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিযুক্ত করিতে লাগিল।—একদল ঝরণা হইতে পাত্র ডুবাইয়া জল তুলিতে লাগিল, কোনও দল বা তাহা বহন করিয়া লইয়া আসিতে লাগিল, কোনও দল বা নূতন নূতন ঝরণা আবিষ্কার করিতে প্রেরিত হইল।—ক্রমশঃ সমস্ত জল একস্থানে আসিয়া জমিতে লাগিল। তখন ক্যাপিটালিষ্টরা এই সকল লোকদের দ্বারা প্রকাণ্ড এক চৌবাচ্চা খনন করাইয়া লইল—ইহার নাম হইল Market অর্থাৎ বাজার। কারণ এই স্থানেই সকলকে—এমন কি যাহারা জল বহন করিয়া আনিত, তাহাদেরও,—পানীয় জলের জন্য আসিতে হইত।—ক্যাপিটালিষ্টরা দেশের সর্ব্বসাধারণকে বলিয়া দিয়াছিল—

"চৌবাচ্চায় অর্থাৎ এই মার্কেটে ঢালিবার জন্য তোমরা এই যে এক ঘড়া করিয়া জল লইয়া আসিবে—

ইহার প্রত্যেক ঘড়ার জন্য আমরা তোমাদের এক আনা করিয়া দিব।—কিন্তু তোমাদের এবং তোমাদের পরিবার বর্গের জন্য যে জল আমরা এই চৌবাচ্চা হইতে তুলিয়া দিব, তাহার প্রত্যেক ঘড়ার জন্য তোমাদের দুই আনা করিয়া দিতে হইবে। এই যে এক আনা করিয়া আমরা বেশী লইতেছি—এ টুকু হইতেছে আমাদের Profit অর্থাৎ লাভ। কোনও লাভ না থাকিলে এত কাণ্ড তোমাদের জন্য আমরা কেন করিতে যাইব?"

কথাটাকে খুব যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া সকলে বহুদিন পর্য্যন্ত বহু পরিশ্রমে সেই চৌবাচ্চায় জল ঢালিতে লাগিল। প্রতি ঘড়া জল আনিয়া তাহারা এক আনা পাইত এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় জলের জন্য ঘড়া প্রতি তাহাদিগকে ক্যাপিটালিষ্টদের দুই আনা করিয়া দিতে হইত।—

অবশেষে একদিন দেখা গেল, Market অর্থাৎ চৌবাচ্চা জলে ভরিয়া উঠিয়া ছাপাইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ ছিল। লোকে এক ঘড়া করিয়া জল চৌবাচ্চায় ঢালিয়া যাহা পাইত তাহাতে অর্দ্ধঘড়ার বেশী জল কেনা যায় না। অতএব এইরূপে অর্দ্ধ ঘড়া করিয়া জল জমিয়া চৌবাচ্চা ভরিয়া উঠিল। এ জল খরচ হইবার কোনও উপায় ছিল না—কারণ ক্যাপিটালিষ্টদের সংখ্যা বেশী ছিল না, এবং অন্যদের অপেক্ষা অধিক জলও তাহারা পান করিতে পারিত না। চৌবাচ্চায় আর জল রাখিবার স্থান নাই দেখিয়া ক্যাপিটালিষ্টরা সকলকে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিল—

"আর জল আনার প্রয়োজন নাই—দেখিতেছ না বাজার অর্থাৎ চৌবাচ্চা জলে ভরিয়া উঠিয়াছে?—এখন তোমরা জল কিনিতে থাক, তোমরা জল লইয়া গেলে, চৌবাচ্চা যখন খালি হইয়া আসিবে, তখন তোমাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে।" অতঃপর ক্যাপিটালিষ্টরা আর কাহাকেও চৌবাচ্চায় জল আনিতে দিল না। জল আনিয়া দিয়া লোকে যে এক আনা করিয়া উপার্জ্জন করিত এখন তাহা বন্ধ হওয়ায় কাহারও আর জল কিনিবারও সামর্থ্য রহিল না!—অল্পদিনের মধ্যেই ক্যাপিটালিষ্টরা দেখিল তাহাদের কাছ হইতে কেহ কিছু ক্রয় করিতেছে না বলিয়া, আর তাহাদের লাভও হইতেছে না।—তখন তাহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজপথে অলিগলিতে বনে জঙ্গলে লোক পাঠাইল, তাহারা সর্ব্বত্র চীৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "যদি কেহ তৃষ্ণার্ত্ত থাক, শীঘ্র এস, চৌবাচ্চায় যথেষ্ট জল আছে—কে কে জল কিনিবে শীঘ্র এস!"—ক্যাপিটালিষ্টরা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতে লাগিল, সময় খারাপ পড়িয়াছে, বিক্রয় একেবারে বন্ধ, এখন ভাল করিয়া বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

তৃষ্ণাকাতর জনসাধারণ জলের কাছে আসিয়া ক্যাপিটালিষ্টদের বলিতে লাগিল, তোমরা যদি আমাদের কাজে নিযুক্ত না কর, তবে আমরা কি দিয়া জল কিনিব!—পূর্ব্বের মত আমাদের কাজ দাও, আমরা খুসী হইয়া নিজের গরজে কিনিব—লোক পাঠাইয়া তোমাদের বিজ্ঞাপন দিতে হইবে না।—

ক্যাপিটালিষ্টরা বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি অদ্ভুত কথা! দেখিতেছ না বাজার অর্থাৎ চৌবাচ্চা জলে ছাপাইয়া পড়িতেছে! আগে তোমরা কিনিতে আরম্ভ কর, চৌবাচ্চা খালি হোক—নহিলে তোমাদের নিযুক্ত করি কেমন করিয়া!" সুতরাং চৌবাচ্চা জলে ভরিয়া রহিল কিন্তু লোকে তৃষ্ণায় মরিতে লাগিল। ক্যাপিটালিষ্টদেরও আর লাভ হয় না।—চারিদিকে কথা উঠিল—দেশে একটা সঙ্কটের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

জল না পাইয়া জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠিতে লাগিল—তাহাদের কোলাহলে সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া ক্যাপিটালিষ্টরা পণ্ডিতের সন্ধানে লোক পাঠাইল। তাঁহারা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "এই দুর্বিপাকের জন্য মূর্খেরা কেন যে আপনাদের দোষ দিতেছে তাহা ত বুঝিলাম না—সূর্য্যের দেহে এ বৎসর যে কাল কাল দাগ দেখা যাইতেছে তাহারই জন্য এ সমস্ত ঘটিতেছে—লোকেও মরিতেছে। আপনাদেরও লাভ হইতেছে না।" ক্যাপিটালিষ্টরা ইঁহাদের পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া জনসাধারণের মধ্যে ইঁহাদের পাঠাইয়া দিল সেখানে গিয়া ইঁহারা অদৃষ্ট, চন্দ্র সূর্য্যের প্রভাব, দ্রব্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন করিবার কুফল প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন দেশে জলের পরিমাণ অতিশয় বাড়িয়া গেছে, কাজেই তাহাদের তৃষ্ণায় মরিতে হইবে। কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত মূর্খরা কিছু না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে ঢিল মারিয়া তাড়াইয়া দিল—প্রাচুর্য্য হইতে দুর্ভিক্ষ এবং বাহুল্য হইতে শূন্যতার সূক্ষ্মতত্ত্বে তাহারা প্রবেশ করিতে পারিল না।

ক্যাপিটালিষ্টরা যখন দেখিল কিছুতেই জনসাধারণকে থামাইয়া রাখা যাইতেছে না তখন চৌবাচ্চার কাছে গিয়া তাহারা তাহাদের অঙ্গুলি জলে ডুবাইয়া সমাগত জনসাধারণের দিকে বিন্দু বিন্দু জল ছড়াইয়া ফেলিল—অর্থাৎ "চ্যারিটি" করিতে লাগিল। পণ্ডিত ও পুরোহিতেরা ইহাদের দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ইহাতে কাহারও তৃষ্ণা দূর হইল না—জলের জন্য ক্রমে সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে—শীঘ্রই হয় ত সকলে চৌবাচ্চা আক্রমণ করিয়া লুটপাট আরম্ভ করিবে ইহা আশঙ্কা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে

ক্যাপিটালিষ্টরা গুপ্তদূত প্রেরণ করিতে লাগিল। ইহারা সাধারণের মধ্যে বুদ্ধিমান ও বলবান লোকদের গোপনে গিয়া বলিতে লাগিল "তোমরা কেন ইহাদের পাল্লায় পড়িয়া মারা যাইতেছ, তোমাদের জলের ভাবনা কি, ক্যাপিটালিষ্টরা তোমাদিগকে তাঁহাদের দলে গ্রহণ করিবেন।" কৌশলে এই সকল লোককে দলভুক্ত করিয়া ক্যাপিটালিষ্টরা সেনা বিভাগ গঠন করিয়া তুলিল—অন্য কেহ চৌবাচ্চার কাছে আসিলে ইহারা তাহাদের মারিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল।

ইহার বহুদিন পরে দেখা গেল চৌবাচ্চা ক্রমশঃ খালি হইয়া আসিয়াছে। কারণ ইতিমধ্যে ক্যাপিটালিষ্টরা জলের ঝরণা, মাছের পুকুর, স্নানাগার প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়া জল খরচ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্যাপিটালিষ্টরা যখন দেখিল চৌবাচ্চা খালি হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহারা বলিল সঙ্কট কাটিয়া গেছে! তখন তাহারা আবার লোকদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া কাজ দিতে লাগিল। বলা বাহুল্য পূর্ব্বের মতই প্রতি ঘড়া জল আনিয়া চৌবাচ্চায় ঢালিলে তাহারা এক আনা পাইত—কিন্তু চৌবাচ্চা হইতে জল কিনিতে হইলে ঘড়া প্রতি তাহাদের দুই আনা করিয়া দিতে হইত।—অল্প দিন পরেই আবার পূর্ব্বের মতই চৌবাচ্চা ছাপাইয়া জল পড়িয়া যাইতে লাগিল।—কাজেই লোকের জল আনাও বন্ধ হইল।

এইরূপে বহুবার চৌবাচ্চা ভরিবার এবং ক্যাপিটালিষ্টরা জল এই বিলাসে ব্যসনে নষ্ট না করা পর্য্যন্ত তৃষ্ণায় ছটফট করিবার পর, দেশে একদল লোকের সৃষ্টি হইল, ক্যাপিটালিষ্টরা ইহাদের agitators অর্থাৎ আন্দোলনকারী বলিত—কারণ ইহারা জনসমাজে গিয়া ক্যাপিটালিষ্টদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিত—ইহারা বলিত ক্যাপিটালিষ্টদের ছাড়িয়া নিজেরা দল বাঁধ, তাহা হইলে আর জলকষ্টে মরিবে না। লোকে ইহাদের শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত বলিয়া ক্যাপিটালিষ্টরা ইহাদের কিছু করিতে পারিত না, কিন্তু ইহাদের উপর তাহারা জাতক্রোধ ছিল। ইহারা লোকেদের কাছে গিয়া বলিত—"তোমরা কি নির্ব্বোধ—এখন সব যেমন চলিতেছে সেরূপ যদি না চলে তবে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে, এ মিথ্যাকে এখনও তোমরা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবে!—ক্যাপিটালিষ্ট, পুরোহিত মাহিয়ানা-করা-পণ্ডিতেরা স্বার্থের জন্য তোমাদের মনে যে সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে তাহাকে দূর করিয়া দাও।—ঈশ্বরের ইচ্ছা তোমরা দারিদ্র্যে, রোগে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিবে এমন কথা যাহারা বলে তাহারা কি ধর্ম্মযাজক হইতে পারে?—চৌবাচ্চা ছাপাইয়া জল পড়িতেছে, অথচ তোমরা তৃষ্ণায় যে মরিতেছ, তাহার আসল কারণ এক ঘড়া জল এক আনায় বিক্রয় করিয়া ক্যাপিটালিষ্টদের লাভের অনুরোধে তোমাদের দুই আনা করিয়া কিনিতে হইতেছে বলিয়া!—বুঝিতে পারিতেছ না কেন থাকিয়া থাকিয়া চৌবাচ্চা ভরিয়া উঠিতেছে! দেখিতে পাইতেছ যতই তোমরা উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছ যত বেশী পরিশ্রম করিয়া জল আনিতেছ, ততই শীঘ্র শীঘ্র এই ক্যাপিটালিষ্টদের লাভের জন্য চৌবাচ্চা ভরিয়া উঠিতেছে এবং তোমাদের তৃষ্ণায় মরিতে হইতেছে?"

প্রথম প্রথম কেহই ইহাদের কথায় বিশেষ সায় দিত না,—অধিকাংশ লোকই ইহাদের কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত করিত না। কিন্তু ক্রমে লোকের সে ভাব কাটিয়া গেল—কি করিলে যে দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে অনেকে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু কোনও কূল কিনারা না পাইয়া তাহারা আন্দোলনকারীদের কাছে গিয়া বলিল "এ সমস্যার আমরা ত কোনও উপায় জানি না—তোমরা জান?" তাহারা বলিল, "হাঁ, এক উপায় আছে।"

লোকে বিশ্বাস করিল না। তাহারা বলিল অনেকবার অনেকের কাছে অমন উপায়ের কথা শুনিয়াছি—অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে অনেকবার তাহার সন্ধানে ছুটিয়াছি, কিন্তু কিছুই ত হইল না।—আমাদের ঠকাইও না—উপায়ের কথা আর বলিও না, দুর্ভাগ্যের উপর আবার এই মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তোমাদের কি লাভ হইতেছে?

এ্যাজিটেটাররা বলিল—"তোমরা যে ক্যাপিটালিষ্টদের লাভ দাও—তাহা কেন দাও? জল কি তাহারা আনিয়াছে, চৌবাচ্চা কি তাহারা খুঁড়িয়াছে?—তাহারা তোমাদের দল বাঁধিয়া দিয়া যে খাটাইতেছে, তোমাদিগকে তাহারই মূল্য দিতে হইতেছে। তোমরা কেন নিজেদের দল বাঁধিয়া দাও না, নিজেদের নিজেরা খাটাও না—তাহা হইলে এই জলভরা চৌবাচ্চা তোমাদের হইবে—তৃষ্ণা মিটাইবার পর তোমরা ক্যাপিটালিষ্টদের মত স্নান ও মাছের জন্য উৎসেরও সৃষ্টি করিতে পারিবে; তখন এ সমস্ত শুধু কয়েকজনের জন্য না হইয়া সকলের হইতে পারিবে!" শুনিয়া সকলে বলিল, "কথাটা ত শুনাইতেছে ভাল, কিন্তু ইহাকে কাজে পরিণত করা যায় কি করিয়া?

আন্দোলনকারীরা বলিল—কতকগুলি সৎ বুদ্ধিমান ও কর্ম্মিষ্ঠ লোক তোমাদের মধ্য হইতে বাছিয়া লও। ইহারা তোমাদের দল বাঁধিয়া দিবেন—কার্য্যবিভাগ করিয়া দিবেন, যেদিকে যাহাকে পাঠাইলে ভাল হয় তাহাকে সেদিকে পাঠাইবেন—এক কথায় ক্যাপিটালিষ্টরা তোমাদের যেমন করিয়া খাটাইত ইঁহারা তোমাদের তেমন

করিয়াই খাটাইবেন—কিন্তু ইহারা তোমাদের প্রভু হইবেন না, ভ্রাতার ন্যায় তোমাদের সেবা করিবেন—ইঁহারা কোনও বিশেষ লাভ লইবেন না—অন্য সাধারণের সহিত লাভের সমান অংশী হইবেন। মাঝে মাঝে আবশ্যক হইলে ইঁহাদের স্থলে তোমরা অন্যদের নিযুক্ত করিবে, তাঁহারা আবার তোমাদের হইয়া তোমাদের কাজ চালাইবেন। লোকেরা স্তব্ধ হইয়া সকল কথা শুনিল, তাহার পর উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিয়া উঠিল, "আমরা সকলে এক মন হইয়া এইরূপই করিব!"

আরাম শয্যায় ক্যাপিটালিষ্টরা এই চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া উঠিল—সৈন্যেরা কাঁপিয়া উঠিল, বেতনভোগী পণ্ডিত ও পুরোহিতের দল প্রমাদ গণিলেন।—ক্যাপিটালিষ্টদের দিন শেষ হইল।

জনসাধারণ পূর্ব্বোক্ত উপদেশ মত চলিতে লাগিল।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

—•—

সাধু বার্নাড।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীকে য়ুরোপের একটি বিশেষ যুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সেই সময়ে খৃষ্টীয় রাজ্যগুলি ধ্বংস করিবার জন্য খৃষ্টানবিদ্বেষী মুসলমানেরা তরবারি হস্তে মহাসমারোহে য়ুরোপ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিল। অপর দিকে সেই একই সময়ে সমাজের মধ্য হইতে খৃষ্ট-অবিশ্বাসী নাস্তিকের দল তর্কের জটিল জালের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্মনীতিকে নিক্ষেপ করিয়া, ন্যায়শাস্ত্রের শস্ত্রাঘাতে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবার বিপুল চেষ্টা করিতেছিল। এই অন্তর বাহিরের আন্দোলন ও আলোড়নে সমগ্র খৃষ্টীয় সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। সেই যুগে যিনি এক হস্তে মানবের প্রাণে অভয় দিয়াছিলেন, অপর হস্তে দুষ্কৃতকে দূর করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনায় আজ আমরা প্রবৃত্ত হইব। তাঁহার নাম সাধু বার্ণাড।

প্রথম ক্রুজেদ-জয়লাভে যখন য়ুরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল লোকে আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল—তখন বার্ণাড অষ্টমবর্ষীয় বালক মাত্র। তাঁহার পিতা একজন নাইট ছিলেন,—ধর্ম্ম যুদ্ধের ক্রুশচিহ্ন ধারণ করিয়া জেরুজিলামে গিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বালকের মনে অবশ্য এই ঘটনাটি মুদ্রিত হইয়াছিল। গৃহে তাঁহার জননীর আর এক সাধ্বী মূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। তিনি দরিদ্র-সেবায়, পীড়িতের পরিচর্য্যায় যে আনন্দ পাইতেন—তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি খৃষ্টীয় সমাজে সাধ্বী বলিয়া পরিচিতা ও সম্মানিতা ছিলেন। বালক বার্ণাড জন্মাবধি অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার আর নাইট্ হওয়া হইল না। আর বাল্যকাল হইতে তাঁহার হৃদয়খানি ফুলের ন্যায় সুন্দর ও দেবশিশুর ন্যায় ভক্তিমান ছিল বলিয়া কৈশোরে অধ্যয়ন কালে তিনি শুষ্ক কঠোর শ্রদ্ধাহীন নৈয়ায়িক হইতে পারিলেন না। সেই বাল্যকাল হইতেই তিনি পবিত্র ও আত্মসংযত; ব্যাকুল ও অনুসন্ধিৎসু। যখন তাঁহার মন ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গ লইয়া নানা সন্দেহের ঘাতপ্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—তখন একদিন পথে চলিতে চলিতে এক সামান্য ধর্ম্ম-মন্দিরের চূড়া তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মানবের মধ্যে ভগবৎ কৃপা কখন্ আসে তাহা কেহই জানে না;—কি করুণা তাঁহার—বার্ণাডের জীবন সেই মুহূর্ত্তেই স্বর্গপথগামী হইল; তিনি সেই পথের ধারেই বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও সংসার ত্যাগ করিবেন এইরূপ সংকল্প করিলেন। উনবিংশ বৎসর বয়সে প্রথমে তাঁহার আত্মার গভীর ব্যাকুলতার আরম্ভ হয়। তিনি বুদ্ধ ও পলের ন্যায় জীবনকে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য উৎসর্গ করিলেন। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার-সুখ পরিবর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ও খুল্লতাতেরা কি ঘোর সংসারী ছিলেন। সংসারই—তাঁহাদের কাছে বিশ্বের সার পদার্থ বলিয়া বোধ হইত; তাঁহাদিগকে এই যুবক কেমন করিয়া ধর্ম্মসাধনার পথে লইয়া গেলেন—তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়।

কিছুকালের জন্য বার্ণাড সিঁটো মঠের ক্ষুদ্র গুহায় বসিয়া ঘোর তপস্যা করিলেন। সেইখানেই প্রথমে তিনি জীবনের রসধারার মূল উৎসের সন্ধান পাইলেন—তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি সেইখানে গঠিত হইল। সিঁটোর মঠাচার্য্য এই যুবক সাধককে অপর স্থানে গিয়া মঠ স্থাপনের আদেশ দিলেন। সিঁটোর মঠ অত্যন্ত বৃহৎ ও জনপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া শান্তিপ্রিয় বার্ণাডের আত্মা আরও নির্জ্জন স্থানের জন্য লালায়িত হইয়াছিল। দ্বাদশটি শিষ্য সঙ্গে লইয়া তিনি ওয়ার্ম্মবুড উপত্যকার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর তীরে তাঁহার মঠস্থাপন করিলেন। সেই স্থানের নাম ক্লেয়ারভো। কালে ইহাই জগতদ্বিখ্যাত হইয়াছিল।

স্বাধীনভাবে নূতন স্থানে আসিয়া বার্ণাডের জীবন যেন খুলিয়া গেল। তাঁহারই অদম্য অক্লান্ত উৎসাহে

ক্ষুধার্ত্ত, পরিশ্রান্ত, শীতার্ত্ত সন্ন্যাসীরা নবজীবন লাভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে ক্লেরোভোকে বিখ্যাত করিয়া তুলিল। তাহাদের আচার্য্যের জীবন সর্ব্বতোভাবে তাহাদের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। এমন জীবনী শক্তি যেখানে সর্ব্বদা কার্য্য করিতে থাকে, সেখানে শ্রী আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে।

পনের বৎসর এই মঠের মধ্যে বাস করিয়া তিনি অজিত শক্তি সঞ্চয় করিলেন। সেই শক্তিই পরে সমগ্র য়ুরোপকে তাঁহার করতলগত ক্রীড়নকের ন্যায় করিয়া তুলিল। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের প্রভা, উদার হৃদয়ের মাধুর্য্য ক্রমেই নানালোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার বিশাল স্নেহালিঙ্গনের মধ্যে আসিয়া সকল বিরোধ মিটিয়া গেল, তাঁহার কঠোরতার কাছে সকল দুর্বৃত্ত পরাভূত হইল।

তাঁহার সে উদার প্রেমের কাছে কি ধনী, কি নির্ধন সকলে তৃপ্ত হইত। দেশের মধ্যে যে কোনো স্থানে সামাজিক বা নৈতিক ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়াছে অথবা রাজনৈতিক অবিচার বা অত্যাচার সম্পাদিত হইয়াছে—সেখানে তিনি বুক দিয়া পড়িয়াছেন। যখন শ্যাম্পেনের প্রবল ভূস্বামী অন্যায়রূপে তাঁহার এক প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করেন, তাহাকে অপমানিত করেন ও অবশেষে নৃশংস ভাবে তাহার চক্ষু উৎপাটন করিলেন, তখন অসহায় উৎপীড়িত প্রজা আসিয়া বার্ণাডের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। তিনি সেই ক্রোধোন্মত্ত প্রতি-হিংসাপরায়ণ ভূস্বামীর সম্মুখীন হইয়া ঘটনার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া নিরপরাধের সম্পত্তি ফিরাইলেন। যখন ফ্রান্সের রাজা সিস্টার সিয়ান (Cistercian) সন্ন্যাসীদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষা করিলেন। এই প্রকারের শত শত ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই সময়ে তাঁহার বিখ্যাত পত্রসমূহ লিখিত হয়। বার্ণাড প্রায় চারিশত পত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার অধিকাংশ গুলি এই সময়ে লিখিত। তখনকার দিনে এই প্রকারের মহাপুরুষের নিকট হইতে সাহায্য লইতে কেহ বিরত থাকিত না। বার্ণাডের কাছে য়ুরোপের রাজাদের দূত আসিয়া পরামর্শ লইত, পোপের লোক তাঁহার মতামত গ্রহণ করিত। তদ্ভিন্ন কতশত সন্ন্যাসীকে তিনি পত্র লিখিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি হয়তো রাজাদের নিকট দশ ছত্র পত্র দিয়া ক্ষান্ত হইতেন, কিন্তু কোনে কোনো সন্ন্যাসীকে প্রয়োজনবোধে দশ পৃষ্ঠা পত্রও লিখিতেন। তিনি মোটেই সম্মানের জন্য ব্যগ্র ছিলেন না—কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, কি চর্চ্চবিষয়ক ক্ষমতা—তাঁহার উপর আপনি যেন আসিয়া পড়িত। কিন্তু কোথাও তিনি আপনা হইতে তাঁহার মতামত, পরামর্শ প্রভৃতি যাচিয়া দিতেন না। উৎপীড়িত প্রজা, অনুতপ্ত ভূস্বামী সন্দিগ্ধ সন্ন্যাসী, তার্কিক ছাত্র, পরিত্যক্ত স্ত্রী,—তাঁহারই কাছে তাহাদের সকল প্রশ্নের, সকল সংগ্রামের, সকল সন্দেহের মীমাংসার জন্য পত্র লিখিত।

কিন্তু এইবার তাঁহাকে জগতের কার্য্যে নামিতে হইল। ফরাসী ঐতিহাসিক মিশ্‌লে বলিয়াছেন যে বার্ণাড জগতের কাছে আপনাকে ধার দিতেন মাত্র, কিন্তু একেবারে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দিতেন না। কথাটি অতি সুন্দর, ইহাই পরিপূর্ণ মানব জীবনের আদর্শ। আমরা জগতে কর্ম্মের মধ্যে লিপ্ত থাকিব, কিন্তু অবিনাশী পুরুষের সহিত আত্মা যুক্ত থাকিবে।

এই সময়ে রোমে একজন ধনী ইহুদী ছিলেন। তাঁহার অর্থের বল ছিল বলিয়া পোপের মৃত্যুর পর তিনি আপনাকে পোপ বলিয়া প্রচার করিলেন—ভাটিকান্ বা পোপ-প্রাসাদ অধিকার করিলেন, আসল পোপ ইনোসেন্ট বিতাড়িত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র য়ুরোপের চর্চ্চমধ্যে দুইটি দল হইয়া উঠিল—প্রতি নগরে দুইজন পাদরী প্রতি গ্রামে দুইজন ধর্ম্মযাজক দুই পক্ষ অবলম্বন করিলেন। দেখিতে দেখিতে এই অধার্ম্মিক ধর্ম্মসম্রাটের ক্ষমতা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরা ইহা দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল ও ধর্ম্মাধিকরণকে তাহা বিচার করিবার জন্য একটি সভা আহ্বান করিল। সকলে একবাক্যে বার্ণাডকে তাহার সভাপতি করিলেন। সকলে বলিলেন বার্ণাডের মীমাংসা আমরা মাথা পাতিয়া লইব। এমনি তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। বার্ণাড উপবাস করিয়া, প্রার্থনা করিয়া দিন কাটাইলেন; তার পর সেই বিরাট সভায় উপস্থিত হইয়া উভয় পোপের দিক হইতে যাহা বলিবার আছে শ্রবণ করিয়া তিনি ইনোসেন্টের পক্ষ সমর্থন করিলেন। সে মীমাংসা সকলে মহোল্লাসে গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু সেই সভায় মাত্র কয়েকটি লোক ইনোসেন্টকে মানিয়া লইল। সমগ্র পশ্চিম য়ুরোপের প্রত্যেক চার্চ্চে বিরোধ, প্রত্যেক নগরে বিরোধ! তখন তাঁহাকে ন্যায়কে জয়যুক্ত করিবার জন্য সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীরে নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে হইল। য়ুরোপের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে হইল। সে প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতার কাছে বিরোধ আপনি মাথা অবনত করিল। সাত বৎসর ধরিয়া এই বিরোধ চলিয়াছিল। সাত বৎসর পোপ তাঁহার আবাস হইতে বিতাড়িত। ফ্রান্সের রাজাকে তাঁহার দলস্থ করিয়া বার্ণাড ইংলণ্ডের জ্ঞানীরাজা হেনরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বলি-

লেন—'মহারাজ, যথার্থ পোপকে স্বীকার করুন—ইহাতে যদি কোনো পাপ হয়, তবে সে পাপ আমার হইল।' হেনরী বার্ণাডের মতে মত দিলেন। আকোয়াটিনের প্রতাপশালী ভূস্বামী, সিসিলির রাজা কিছুতেই যথার্থ পোপকে গ্রহণ করিবেন না—বার্ণাড সেই স্থানসমূহে গিয়া প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিয়া তাঁহাদিগকে মত করাইলেন।

বাহিরের বিরোধ দূর হইল। শীর্ণদেহে, ভগ্নহৃদয়ে য়ুরোপের শান্তিস্থাপয়িতা তাঁহার শান্তিময় মঠে ফিরিলেন। সেইখানে তাঁহার সরলজীবনের উপর বাহিরের অনেক বোঝা চাপিয়াছিল—সেগুলিকে এখন বাহিরে রাখিয়া তাঁহার নির্জন গুহায় দিনগুলি কাটাইবার জন্য আসিলেন। সেই প্রভাতের বন্দনা, নিশীথের গম্ভীর প্রার্থনা, তাঁহার সেই গুহায় কঠোর সাধনা—তাঁহার চিত্তকে একটি মধুর রসে পূর্ণ করিল।

বাহিরের দলাদলি চেষ্টা করিলে মিটিতে পারে। কিন্তু মানবের মনের মধ্যে যে বিচারবুদ্ধি অহরহ বিশ্বাসকে নাড়া দিয়া তাহাকে ভিত্তিহীন করিবার প্রয়াসী তাহাকে বাধা দিবে কে! তার্কিক ও নৈয়ায়িকদের পাণ্ডিত্যের উৎপাতে খৃষ্টধর্ম্মকে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হইতেছিল। শুধু তাহাই নহে। সে যুগে ধর্ম্ম তখনো গড়ে নাই বলিয়া তখন অবিশ্বাসের আঘাত মানুষকে যে ধর্ম্মহীন নীতিহীন ও মূঢ় পশু করিয়া ফেলিতে পারিত এ কথা বিরুদ্ধবাদীরা ভুলিয়া গেলেন। সেই জন্যই আবেলার্ডের পতন হইল। বার্ণাডের সহিত আবের্লাডের বাক্‌যুদ্ধ ও অবশেষে দ্বাদশ-শতাব্দীর দার্শনিকের পরাজয়ের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার পুনরায় উল্লেখ করিলাম না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আবের্লাডের পরাজয়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম রক্ষা পাইল; নতুবা তাঁহার নীতিহীন-খৃষ্টহীন ধর্ম্মমত য়ুরোপের সমূহ অকল্যাণ সাধন করিত। লুথার আসিবার সময় তখনো হয় নাই।

বার্ণাডের বয়স এখন পঞ্চাশ বৎসর। আজ পঞ্চদশ বৎসর তিনি কর্ম্মজগতের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ঘুরিতেছেন। কিন্তু এইবার হইতে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার অমর নাম য়ুরোপীয় ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। সকল ঘটনা এখানে বিবৃত করা অসম্ভব। কিন্তু চার্চ্চ সম্বন্ধীয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্যে এইবার তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। সেইটি হইতেছে—দ্বিতীয়-ধর্ম্মযুদ্ধ। দ্বিতীয় ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক। মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে এই ধর্ম্মযুদ্ধ যতটা যুদ্ধের জন্য হইয়াছিল ততটা ধর্ম্মের জন্য হয় নাই। সাধুবার্ণাডকে পোপ এই ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সে নিতান্ত দুর্ব্বল ক্ষীণ শরীরে তিনি য়ুরোপের নগরে নগরে প্রচারে বাহির হইলেন। জারমেনী সম্রাট রোমীয় পোপের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ যুদ্ধে কিছুতেই যাইবেন না বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন; বার্ণাডের এক উপদেশে তিনি মন্দিরে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, "না, না আমি অকৃতজ্ঞ হইব না! আমি খৃষ্টকে সেবা করিব তাঁহার ক্রুশভার বহন করিয়া যেখানে তিনি আদেশ করিবেন সেইখানে যাইব"। এমন যাঁহার ক্ষমতা তাঁহার কাছে য়ুরোপের সকল নৃপতি মাথা নত করিবে না ত কি? যুদ্ধসজ্জা হইতে লাগিল। তারপর যাহা হইল তাহা ইতিহাসের কথা। অধিকাংশ সৈন্য জেরুজিলামে ও পথে প্রাণ ত্যাগ করিল—পবিত্র স্থান অধিকার করা হইল না। এই সংবাদে বৃদ্ধ বার্ণাড ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। দ্বিতীয় ক্রুজেদের যখন আয়োজন হইতেছিল তখন কোনো কর্ম্মে বার্ণাডের মহত্ব সর্ব্বাপেক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। য়ুরোপে খৃষ্ট সমাজে ইহুদীদের স্থান কিপ্রকার ঘৃনিত তাহা কাহারও অবিদিত নহে। প্রথম ধর্ম্মযুদ্ধের সময়ে ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টানরা অভিশপ্ত, ইহুদীগণের নিকট হইতে অর্থ লুণ্ঠন করেন। এইবারও সেই রব উঠিবামাত্র বার্ণাড তাহা রোধ করিলেন। তিনি উৎপীড়নকারী নাগরিকগণকে বার বার বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্রে লিখিলেন যেন ইহুদীগণের উপর বৃথা অত্যাচার করা না হয়। মেয়েন্স নামক কোনো স্থানে জনসাধারণ ইহুদীগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছিল—বার্ণাড সেখানে গিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতার সহিত, ভগবানের দোহাই দিয়া অধিবাসিগণকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। হিংস্রস্বভাব পশু যেমন একবার রক্তের স্বাদ পাইলে পুনরায় রক্তপানের জন্য লালায়িত হয় তেমনি জনসাধারণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে চাহিল না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় বার্ণাড অবশেষে জয়ী হইলেন। এই ঘটনাটি বার্ণাডের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর চিত্র। বার্ণাড মধ্যযুগের নৃশংসতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়কর বোধ হয়।

দ্বিতীয় ক্রুজেদের ব্যর্থতার পর তিনি আরও কয়েকটি অবিশ্বাসীর সহিত তর্ক করেন ও আরও কতকগুলি রাজনৈতিক বিরোধ মিটাইয়া দেন। অবশেষে ইনোসেন্টের মৃত্যুর পর তাঁহার এক শিষ্য, বন্ধু, ধর্ম্মপুত্র পোপ রূপে গৃহীত হইলেন। তাঁহার জন্য বার্ণাড চার্চ্চের কর্ত্তব্য সমন্ধে পাঁচ খণ্ডের এক গ্রন্থরচনা করেন। বিশ বৎসর সমগ্র য়ুরোপের কর্ণধার রূপে যিনি ছিলেন—তাঁহার পক্ষেই এই প্রকারের

পুস্তক লেখা সম্ভব। ইহারই কিছু দিন পরে তিনি তাঁহার ক্লেরাভোঁর মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইবার তাঁহার জীর্ণ অস্থি কয়খানি সেই শান্ত উপত্যকার মধ্যে ফেলিয়া শান্তিময়ের ক্রোড়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরেই তাঁহার সেই বহুদিবসের সাধনরত গৃহে, নিশীথের ব্যথিত হৃদয়ের অশ্রুধৌত গুহায় তাঁহার মৃত্যু হইল।

সাধুবার্ণাড দ্বাদশ শতাব্দীর গুরু ছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনিই মন্ত্রণাদাতা, ধর্ম্মজগতে তিনি উপদেষ্টা, সামাজিক জীবনে তিনি শান্তিস্থাপয়িতা। দ্বাদশ-শতাব্দী তাঁহারই মত একজন লোককে চাহিতেছিল—যিনি সহানুভূতির সহিত ধর্ম্মকে দেখিবেন সমাজকে বিচার করিবেন—যিনি সময়ের উপযুক্ত করিয়া সমস্ত হিতাহিত বিধান করিতে পারিবেন। এমন লোকেরই প্রয়োজন সমাজ অনুভব করিতেছিল। বার্ণাড তাহারই আদর্শ; সেই জন্য মধ্যযুগে তিনি এত পূজিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বসংবাদ।

আয়র্লণ্ড ও ভারতবর্ষ।

কবি য়েট্‌স্ ডাব্লিনে এক বক্তৃতায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে আয়র্লণ্ডের অবস্থার সাদৃশ্য দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, আধুনিক ভারতবর্ষকে যথার্থপথে চালিত করিবার জন্য যে সকল মনীষী ভারতবর্ষে কাজ করিতেছে তাহা হইতে আয়র্লণ্ডের অনেক জিনিস শিক্ষা করিবার আছে। ভারতবর্ষেও কিছুকাল পূর্ব্বে শিল্প বল, ভাষা বল—সমস্তই বৈদেশিক প্রভাবে নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। আয়র্লণ্ডেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। এখানে যেমন বাল্যবয়স হইতে ছাত্রগণকে ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া সকল জ্ঞানের বিষয়কে আয়ত্ত করিতে হইত, আয়র্লণ্ডেও তদ্রূপই হইত। ভারতবর্ষে এই বৈদেশিক অনুকরণের বিরুদ্ধে যেমন প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া একটা ছোটখাটো গোচের বিপ্লব পর্য্যন্ত ঘটিয়া গেল, আয়র্লণ্ডেও ঠিক এম্নি ভাবেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন জাগিয়াছিল। আয়র্লণ্ডের গেলিক্‌লিগের কার্য্যপ্রণালীর সঙ্গে আধুনিক বাংলাদেশে যে জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহার আদর্শ ও প্রভাবের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। আমাদের দেশের সাহিত্যের ধারার সঙ্গে পোলিটিক্যাল আন্দোলনাদির ধারার ভাব ও আদর্শের কোথাও ঐক্য নাই। দেশের গৌরবময় অতীত, দেশের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ও দেশের সেই অভিপ্রায় ভবিষ্যতে আপনাকে কি ভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে—এ সকল বড় আলোচনা ও বড় প্রশ্ন আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগের মুখে শোনা যায় না—তাঁহাদের মনেও ইহারা স্থান পায় কি না সন্দেহ। তাঁহারা উপস্থিত প্রয়োজন সাধনের দিকটাকেই বড় করিয়া দেখেন—আদর্শকে বড় করিয়া দেখেন না। অথচ সাহিত্য সেই সকলের চেয়ে বড় দেখাটাকেই দেখায়, সকলের চেয়ে বড় বাণীকেই উপস্থিত করে। সে দেশকে যেখানে উদ্বোধিত করিতে চায় সে তাহার চিরন্তন স্বরূপে—দেশের যে স্বরূপ সমস্ত বিশ্বমানবের সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে উদ্‌ঘাটিত হইবার অপেক্ষায় আছে। কবি য়েট্‌স্ বলেন আয়র্লণ্ডের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও সাহিত্যের চেষ্টার মধ্যেও ঠিক এই একই বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। য়েট্‌সের এই বক্তৃতা আমাদের সাহিত্যের—আমাদের কেন সকল দেশের আধুনিক সাহিত্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার মতো বক্তৃতাই হইয়াছে।

আধুনিক মানুষ কি পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর হইয়াছে?

সকলেই জানেন যে এ প্রশ্ন এ যুগের একটি বিশেষ ভাবিবার প্রশ্ন। সার এল্‌ফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের ন্যায় বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন যে আমরা আমাদের অর্দ্ধসভ্য পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষা মানসিক ও নৈতিক দিকে অনেক হীন হইয়া পড়িয়াছি। শুধু ওয়ালেস্ নন্ এই মত আধুনিক জগতে অনেক চিন্তাশীল লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু জিন্‌ফিনো (যাঁহার 'Race Prejudice' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এখনকার কালের জাতিসমস্যাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) এ প্রশ্নের অন্যরূপ উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে অর্থ ও পরমার্থ এই উভয়দিকেই আধুনিক মানুষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। মানুষ মনে মনে এই দুইটি দিক্‌কে পৃথক্ করিয়া বিরুদ্ধ করিয়া দেখে বলিয়া মনে করে যে আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝি পারমার্থিক উন্নতিলাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের ও শক্তির প্রসার যত বাড়িতেছে, তাহার হৃদয়ের প্রসার সেই সঙ্গে না বাড়িয়া পারে না—তাহার সহানুভূতি ততই দূর দেশকালকে অধিকার করিতেছে—তাহার সংকীর্ণতা ততই অপসারিত হইয়া যাইতেছে।

'লা রেভিউ' পত্রে ফিনো লিখিতেছেন :—"আধুনিক মানুষের দৃষ্টি এখন ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র নিবদ্ধ। কোথায় চীন, কোথায় অষ্ট্রেলিয়া—সকল স্থানে যাহা ঘটিতেছে তাহার সহিত আধুনিক মানুষের সহানুভূতির যোগ আছে। মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাই হৌক, গায়ের রং যেমনি হৌক—আজ যে-কোন মানুষের দুর্ভাগ্যের কথা শুনিলে সকল মানুষেরই বুকে বাজে—এমনটি কি পূর্ব্বকালে হইত? আজ যে মানুষ জগতে যুদ্ধবিগ্রহ আর থাকিবে না, সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইবে, এই স্বপ্নও দেখে—ইহা কি তাহার মহত্বের কোন লক্ষণ নহে? আমি মানুষকে সমষ্টিভাবে ধরিতেছি না, ব্যষ্টিভাবে ধরিয়াই বলিতেছি যে মানুষ তাহার পূর্ব্বপুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশি হৃদয়বান্, বুদ্ধিমান ও মহদভিপ্রায়বিশিষ্ট হইয়াছে। আজ "তোমার প্রতিবেশীকে তোমার মত ভালবাস" কথাটি যে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা পূর্ব্বযুগের মনুষ্যের ধারণা ও কল্পনার অনধিগম্য ছিল।"

ইহার পর ফিনো তাঁহার বক্তব্যের পোষকতার জন্য বাইবেলে উল্লিখিত সাধুদিগের চরিতালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিষ্ঠুরতা, দুর্নীতি ও বিবিধ কলুষ প্রদর্শন করিয়াছেন। স্যামুয়েল, এলিজা প্রভৃতি সাধুগণের নৃশংস নরহত্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন আধুনিক যুগে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধেই মানুষের ধারণায় কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হিব্রু দেবতা জিহোভের ক্রোধ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও অনুদারতা কি ভয়ঙ্কর! কিন্তু ইহার ঠিক উল্টা ভগবান খৃষ্টের ক্ষমা, প্রেম ও পুণ্যের পরিপূর্ণ স্বরূপখানি আধুনিক যুগের মানুষের চিত্তলোকেই বিশেষভাবে স্পষ্ট হইয়াছে—ইহা হইতেই আধুনিক মানুষ ও পূর্ব্বকালের মানুষের পার্থক্য অনুমিত হইবে।

ইহার পর ফিনো এখনকার সাধু ও নরহিতব্রত মনুষ্যগণের সহিত পূর্ব্বতন সাধুসন্ন্যাসীগণের তুলনা করিয়াছেন। সেকালের সাধুসন্ন্যাসীরা যে শরীরকে পীড়া দিতেন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতেন সংসারকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন—এ সকলেরও কারণ একটা বিবেচনাহীন অন্ধ স্বার্থপরতা ও আপনাকে লইয়া আপনার বিলাস বলিয়া ফিনো নির্দ্দেশ করেন। যাট বৎসর ধরিয়া একজন সাধু মরুবাসী হইলেন, নিজে ভগবানকে লাভ করিবেন বলিয়া আত্মীয় স্বজনকে ভাসাইয়া তাহাদিগকে পাপ প্রলোভনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আর একজন পলায়ন করিলেন—এ সকল দৃষ্টান্তকে ফিনো কোনমতেই উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত বলিতে চান্ না। ইহাদের সঙ্গে টাইটানিকে যে সকল বীর অন্যের প্রাণরক্ষার্থ নিজেকে মৃত্যুমুখে বিসর্জন করিয়াছে, তাহাদের তুলনা কর! ষ্টেড্ সাহেব আপনাকে বাঁচাইতে হয়ত বা পারিতেন কিন্তু তিনি যে মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়াও সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অন্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় সাহায্য করিলেন—ইহা শুনিলে কি আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয় না? বলিতে ইচ্ছা হয় না যে আমরা মানুষকে এখন যে রকম ছোট করিয়া দেখিতেছি ও যে অপবাদ প্রত্যহ তাহাকে দিতেছি, সে দেখা আমাদের ভুল দেখা, সে অপবাদ সত্য নয়? মানুষের মধ্যে ত্যাগস্বীকারের ভাব—নরহিতের জন্য প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ পরিশ্রম ও প্রয়োজন হইলে প্রাণ বিসর্জ্জনের ভাব এখনই যথেষ্ট পরিমাণে জাগিয়া উঠিয়াছে। "এখনকার মানুষের ধর্ম্ম আর একলা গুহাগহ্বরে, বনে জঙ্গলে নির্জ্জন ধ্যানবিলাসের ধর্ম্ম নয়,—অন্যের প্রতি কর্ত্তব্যকে সর্ব্বাগ্রে তুলিয়া ধরিয়া আপনাকে ভুলিয়া তাহাই সাধন করিবার ধর্ম্মই এখনকার মানুষের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"—

ফিনোর এই রচনার মধ্যে অনেক অতিশয়োক্তি আছে তথাপি ইহা আধুনিক মানুষের পক্ষে খুবই আশাজনক ও উৎসাহবর্দ্ধক জিনিস। আধুনিক কালকে যে সকল মনীষী এ যুগে কেবলি গাল দিয়াছেন—যথা কার্লাইল, রাস্কিন্, টলষ্টয় ও আধুনিক কালের সোসালিষ্টগণ—তাঁহারা উত্তম সদুপদেষ্টা হইলেও যথার্থ মানবপ্রেমিক নহেন। কারণ তাঁহারা একটা সহজ কথাই বিস্মৃত হইয়াছেন যে গাল দিয়া কখনই মানুষের ভাল করা যায় না—মানুষকে ভাল করা যায় একমাত্র প্রেমে ও সহানুভূতিতে। ফিনোর এই বক্তৃতা পড়িলে এখনকার মানুষের সম্বন্ধে আশা ভরসা ও উৎসাহ দশগুণ বাড়িয়া উঠে।

চীনের ভবিষ্যৎ।

ডাক্তার সান্ ইয়াট্সেন চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিউইয়র্কের 'আউট্লুক' পত্রে সুন্দর একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে চীনের সর্ব্বত্র গমনাগমনের সুবিধা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততর হইবার জন্য চীনের প্রজাদের হৃদয় ক্রমশঃ এক হইয়া উঠিতেছে। এখন দেশের কোন স্থানে কোন অশান্তি ঘটিলে সমস্ত দেশময় সে সংবাদ সকলের গোচর হয়।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব হইবার পর হইতে প্রায় এক সহস্র সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছে, অথচ পূর্ব্বে ৪০।৫০ খানির অধিক সংবাদ পত্র চীনে ছিল না। তারপর রেলওয়ের মত টেলিগ্রাফের তারও মানুষের হৃদয়কে বাঁধিবার এক প্রধান উপকরণ। চীনে আজ প্রত্যেক স্থানের সংবাদ সকল স্থানে পৌছিতেছে বলিয়াই চীনের প্রজাকুল এরূপ বূহবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। অহিফেন নিবারণের চেষ্টায় সকল প্রজাকে যেরূপ সম্মিলিত হইতে দেখা গিয়াছে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর!

তাহার পর শিক্ষার বিস্তার। অবশ্য সমস্ত দেশময় স্কুল কলেজ এখনও সংখ্যায় যথেষ্ট নহে, কিন্তু যেরূপ প্রবলবেগে শিক্ষা চীনে প্রসার লাভ করিতেছে, শিক্ষার জন্য চীনবাসীদিগের যেরূপ আগ্রহ দেখা যায়, তাহাতে এ সম্বন্ধে সরকারের তরফ হইতে কোন বিধি স্থির করিবার আবশ্যকতাই দেখা যায় না। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—এ সমস্তই শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। চীনের গভর্ণমেণ্ট দরিদ্র হইলে কি হয়, সাধারণ প্রজাদের ধনবৃদ্ধি যে হইতেছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

তারপর সান্‌ইয়াট্‌সেন মনে করেন যে চীনের সঙ্গে জাপানের সৌহার্দ্দ্য অক্ষুন্ন থাকারই সম্ভাবনা।

চীনকে আজিও ইউরোপীয় শক্তিসমূহ স্বীকার করিতেছেন না—তাহার কারণ তাঁহাদের স্বার্থবুদ্ধি ও ক্ষমতাপ্রিয়তা ছাড়া আর কিছুই নির্দ্দেশ করা যায় না। রাশিয়া যেমন চীনকে না স্বীকার করিয়া মঙ্গোলিয়াকে স্বীকার করিতেছে। কিন্তু অচিরেই যে চীন সকল শক্তিশালী স্বাধীন মহাজাতিগণের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ মাস, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮৪।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৭০৭।০
পূর্ব্বকার স্থিতি	...	৫২৪।৶০
সমষ্টি	...	১২৩১॥৶০
ব্যয়	...	৭১৪॥/৬
স্থিত	...	৫১৭ /৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদিব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৪০০৲

সমাজে ক্যাশে মজুত ১১৭ /৬

৫১৭/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৩৭॥০

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়	২০০৲
নববর্ষের দান	৩০৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৭॥০
	২৩৭॥০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২১৯।৶০
পুস্তকালয়	...	১৫।/০
যন্ত্রালয়	...	২৩৫৲
সমষ্টি	...	৭০৭।০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৫৪৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১০১৸০
পুস্তকালয়	...	৶০
যন্ত্রালয়	...	৩৫৮॥৬
সমষ্টি	...	৭১৪॥/৬

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় সোমবার রাত্রি সাত ঘটিকার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একষষ্টীতম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৪।

৮৪০ সংখ্যা — ১৮৩৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অনুশোচনা।

ঝঞ্ঝা মেঘের বুকের পরশ
তারি নিশ্বাস বায়ু,
বিদ্যুৎ দীপ্তি ঢালিল নেত্রে
চিত্তে পরম আয়ু

সুগোপন কিছু রহিলনা আজ
নয়নে ভুবনে মনে,
কিরণে শাণিত হল শলাকার
খরতর পরশনে!

কঙ্কাল কায় ছিল যা লুকায়ে
পুষ্পশয়ন তলে,
পাষাণ-বিজয়ী অটুট পরাণ
অঙ্কুর দলে দলে,

মর্ম্ম ভেদিয়া বাহিরিয়া এল
দেখা দিল একে একে,
শুধু নিমেষের দৃষ্টির তেজে
লুকান স্বরূপ এঁকে!

শূন্য জীবনের টুটিল প্রতাপ
দীর্ণ হৃদয় পাতি,
শুষ্ক জীবনের ফিরিল মূরতি
শুধু এক রাতারাতি!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

—০—

ভক্তবাণী।

(Paslms of David)

সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তবগান করিব হে প্রভু, তোমার চিরসুন্দর বিশ্বরূপের মহিমা প্রচার করিব।

তোমাতেই আমার আনন্দ প্রসার লাভ করিবে, হে সপ্তলোকের প্রান্তবাসী, হে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ তোমারি নাম সংকীর্ত্তনে আমার জীবন সার্থক হইবে।

আমার শত্রুগণ প্রত্যাহত হইয়া তোমারি চরণ প্রান্তে মৃত্যু বরণ করিবে।

তুমি আমার অধিকার রক্ষা করিয়াছ, তুমি আমায় নির্ব্বাসন কর নাই।

হে চিরন্তন তোমার সিংহাসন অবিনশ্বর, তোমার সম্রাট-মহিমা চির অক্ষুণ্ণ, তোমার ন্যায়ের দণ্ড নিয়ত অপ্রতিহত।

হে ন্যায়বিচারক, তোমার ধর্ম্মাধিকরণে অবিচার অত্যাচারের স্থান কোথায়?

হে দুঃখীর নির্ভর, হে বিপত্তি-নিবারণ হরি দুর্দ্দিনে তুমিই অবলম্বন—হে অকূলের কাণ্ডারী "ভাঙানায়ে" তুমিই পার কর।

তোমার নামের মহিমা যে জানিয়াছে—সে সৌভাগ্য-

বানের জীবন হইতে সংশয় চিরদিনের জন্য তিরোহিত, তোমার অটল সহায়ে তাহার স্থির চিত্ত অবিচলিত আনন্দময়। যে তোমার কাঙাল, তুমি কখনো তাহাকে তাড়না কর না।

হে দয়াময়, দয়া কর আমাকে—আমার অক্ষমতা স্মরণ রাখিয়া আমায় পরিত্যাগ করিও না—মৃত্যুকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া, অমৃতের অবারিত দেবায়তনে আমায় আশ্রয় দাও।

তোমার অক্ষুণ্ণ ন্যায়ের বিধানই তোমার শ্রেষ্ঠ মহিমা, তাহা বহন করাই ভক্তের গৌরব—তাহা অমান্য করে বলিয়াই দুর্ব্বল সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যথা-ক্লিষ্ট দ্বিধা-ভিন্ন।

কাঙালী তোমার দুয়ার হইতে কখনো শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসে না, হে দয়াল প্রভু, ভক্তের আকাঙ্ক্ষা কখনোই তুমি অপূর্ণ রাখনা দীনবৎসল!

হে জাগ্রত চিন্ময়, তোমার প্রকাশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সচেতন হউক, তোমার মহিমা কিরণপাতে ত্রিভুবনের ললাট উজ্জ্বল হউক হে আকাশের জ্যোতিষ্মান অধিদেবতা!

মানবের হীন গর্ব্ব ধূলি-লীন করিয়া দাও—তোমার গৌরব সাধনাই তাহার জীবনের লক্ষ্য হউক।

হে চিরজীবনের বান্ধব, তুমি আজ দূরে দাঁড়াইয়া কেন—এ দুর্দ্দিনে তোমার মুখের আলোকও যদি অদৃশ্য হয়, তবে আর আশ্রয় কোথায় পাইব?

দুষ্টই অহঙ্কারগর্ব্বে দুর্ব্বলকে তাড়না করে, অপরের বিনাশ কামনায় যে জাল বিস্তৃত করে তাহাতে আপনি বাধা পড়ে।

দুষ্টই দুর্ম্মদ বাসনায় দর্প করিয়া থাকে—লোভীকে গৌরব দান করে, হে নির্ম্মল হে করুণা-নিধান তোমার বিধান স্বতন্ত্র। দুষ্টই অহঙ্কার-মরীচিকায় ভ্রান্ত, তোমার মুখের কিরণ তাহার নেত্রগোচর হয় না—হে অন্তর্য্যামী, তাহার চিন্তায় তোমার স্থান নাই।

সে দুঃখ-পথের পান্থ, তোমার আলোক সে প্রদেশে নাই—শত্রুতা অর্জ্জন সে গৌরব জ্ঞান করিয়া থাকে।

তাহার ঐকান্তিক বিশ্বাস, বাধাবিপত্তি তাহার জন্য নয়, অহঙ্কারে সে সর্ব্বজয়ী হইয়াছে।

তাহার মুখের বাক্য নীরস, অভিশাপ-বিষাক্ত, জিহ্বা তাহার কুটিলতার আশ্রয় স্থান—দর্পের আকরভূমি।

গ্রামের গুপ্ত স্থানে তাহার অধিবাস, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নির্দ্দোষ নিষ্পাপকে সে বিনাশ করে, দরিদ্রের ক্ষুদ্র ধন তাহার লুব্ধ দৃষ্টিপাতে বিপদগ্রস্ত।

জাল পাতিয়া ব্যাধ যেমন নিঃসন্দিগ্ধ বিহঙ্গকে পরাধীন করে—সেও তেমনি দরিদ্রের জন্য জাল পাতিয়া বসিয়া আছে—তাহাদিগকে একবার হস্তগত করিতে পারিলে আর মুক্তি দান করে না।

ভুজঙ্গের ন্যায় ভূমি স্পর্শ করিয়া দীনভাবেই সে যাতায়াত করে, তাহার চাতুরী সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে আঘাত যখন করে, তখন মৃতসঞ্জীবনী ভিন্ন আর নিষ্কৃতি লাভ অসাধ্য। মনে মনে সে স্থির ধারণা করিয়া আছে—সর্ব্বজ্ঞ প্রভুও তাহার বিষয়ে ভ্রান্ত তাহার কার্য্যাবলী তাঁহার নিকটও প্রচ্ছন্ন। অবোধের ন্যায় আপন মুখ লুকাইয়া সে মনে করে, কেহ তাহাকে দেখিবে না, আপনি দৃষ্টিহীন বলিয়াই বিশ্বসংসারকে অন্ধ জ্ঞান করিয়াছে। প্রভু একবার উগ্র উজ্জ্বল রুদ্র রূপে আবির্ভূত হও; হে প্রলয়ঙ্কর, ভৈরব ত্রিশূল একবার উত্তোলন কর, পাপের ধ্বংশসাধন কর—দীনভক্তের বিশ্বাসের গৌরব রক্ষা হউক।

পাপের বাহুবল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দাও, হে ভৈরব তোমার পাশুপত অস্ত্রের প্রভাবে তাহার পাশবশক্তি ধূলি-লীন হউক।

দরিদ্র ভক্তের তুমি ভিন্ন আর গতি নাই, পিতার ন্যায় তাহাকে রক্ষা কর, মাতার সমান তাহাকে মমতা কর। তুমি কেবলমাত্র প্রভু ত নও, তুমি যে রাজরাজেন্দ্র অসীম মহিমাময়, একেশ্বর সম্রাট—ত্রিলোক ভরিয়া তোমার প্রকৃতিপুঞ্জের বসতি—তোমার সমকক্ষ আর কেহই নাই। ভীতি বিহ্বল প্রজার আর্ত্ত নিবেদন শ্রবণ করিয়াছ বিধিমত রক্ষা কর তাহাকে—তাহার হৃদয়ে ভক্তির বসতি হউক, ভক্ত বৎসল! তবে তুমি আর বাম হইতে পারিবে না, অনাথের নাথ, তোমার করুণার বিধানে দুর্ব্বল দীন জন চির নির্ভয় হইয়া বসতি করিবে।

প্রভুর চরণ প্রান্তই আমার নির্ভয় আশ্রয় স্থান—ওগো কে তুমি আমাকে পর্ব্বতের সুদূর দেশে পলায়ন করিতে উপদেশ দিতেছ—কে তুমি আমায় বলিতেছ ভীরু পাখী, শিখরের তরুশিরে বাসা বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হও?

কুটিল নির্ম্মমহৃদয় ব্যাধ ধনুঃ আকর্ষণ করিয়া আছে দেখিতেছ না কি? তীক্ষ্ণ তীর এখনি বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইবে, তখন আমার রক্ষা কোথায়!

ভিত্তি যদি ভগ্ন হইয়া যায়, প্রাসাদ কোথায় নির্ম্মাণ করিবে, দেবায়তন কেমন করিয়া অভ্রভেদী করিয়া গড়িয়া তুলিবে? তোমার দেবতা আপন মন্দিরে নিশ্চল প্রতিষ্ঠায় বিরাজ করিতেছেন, গ্রহনক্ষত্রখচিত নীলাম্বর তাঁহার সিংহাসন, দৃষ্টি তাঁহার বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, প্রত্যেক নিমেষ পাতে অগণ্য মানব হৃদয়ের রহস্য তাঁহার সম্মুখে অবারিত। ভক্তের তিনি বিচারক, দুষ্টের তিনি দণ্ডবিধাতা।

পাপলুব্ধদিগের প্রলোভন দ্বিগুণিত হইবে, অগ্নি শিলা বর্ষণে উদ্যম ঝটিকায় জীবন তাহাদিগের বিধ্বস্ত হইবে। ন্যায়ের বিধান প্রচ্ছন্ন নয়, রহস্যের জাল সেখানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

ধার্ম্মিকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি অনিমেষ—তাঁহার প্রসন্ন মুখের সকরুণ স্মিত হাস্য চিরদিন প্রফুল্ল ও নিয়ত জাগরূক।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গীতাপাঠ।

[গতমাসের গীতাপাঠপ্রবন্ধে লেখকের কলমের টানে একটি অশুদ্ধ শ্লোক প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ :—

তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখবন্ধেন বধ্নাতি দুঃখবন্ধেন চানঘ॥

ইহার পরিবর্ত্তে হইবে এইরূপ :—

তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥]

প্রশ্ন॥ তুমি এতক্ষণ ধরিয়া যাহা আমাকে বুঝাইলে—কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বটে; তা ছাড়া, তোমার নিজের কথাগুলিকে তুমি মনোহর শাস্ত্রীয় বেশে সাজাইয়া দাঁড় করাইতেও অনুষ্ঠানের ত্রুটি কর নাই। কিন্তু এত যে তোমার যুক্তিপ্রদর্শনের এবং শাস্ত্রপ্রদর্শনের কৌশল পারিপাট্য—সবই উল্টাইয়া যাইতেছে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের একটি কথার এক-ঝাপটে! তাঁহার প্রণীত আত্মবোধ-নামক পুস্তিকায় স্পষ্ট লেখা আছে—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানভ্যাসাৎ বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ॥"

ইহার অর্থ এই :—

নির্ম্মলীফলের গুঁড়া যেমন জলের সমস্ত মলরাশি নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান তেমনি জীবের অজ্ঞানকলুষ নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ইহার তুমি কি উত্তর দেও?

উত্তর॥ শঙ্করাচার্য্যের মতো অত বড় একজন পাকা মাঝি জ্ঞানতরী'কে অজ্ঞান-সমুদ্রের সারাপথ নির্ব্বিঘ্নে পার করাইয়া আনিয়া মোক্ষডাঙায় পৌঁছিবার সম-সম কালে যদি কিনারায় নৌকাডুবি করেন, তবে তাহাতে কী প্রমাণ হয়? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, নৌকার তলায় কোনো-না-কোনো স্থানে ছিদ্র আছে। সে ছিদ্র যে, কি, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সে ছিদ্র হচ্চে কঠোর অদ্বৈতবাদ। গীতাশাস্ত্রের কোথাও কিন্তু সেরূপ ছিদ্রও নাই—তাহার কথাও নাই। এইজন্য বলি যে, শঙ্করাচার্য্যের মতামতের দায় গীতাশাস্ত্রের স্কন্ধে চাপাইতে যাইবার পূর্ব্বে তোমার উচিত ছিল যুক্তি-বিষয়ে বেদান্তদর্শনের সহিত গীতাশাস্ত্রের কোন জায়গায় মিল এবং কোন্ জায়গায় অমিল তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখা। তাহা যখন তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, তখন আমার কর্ত্তব্য—তোমার সেই উপেক্ষিত বিষয়টিকে যব-নিকার আড়াল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তোমার চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করা। কেননা আমি দেখিতেছি যে, তাহা যদি আমি না করি তবে কিছুতেই তোমার ভুল ভাঙিবে না। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে—যুক্তি-বিষয়ে বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত মতামত কিরূপ তাহার মোট বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে জ্ঞাপন করা নিতান্তই আবশ্যক বিবেচনায় আপাতত তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঞ্চদশ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে প্রশ্ন একটা উত্থাপন করা হইয়াছে এই যে,—

"কিং সর্ব্বান্ বিকারালম্বনান্ অবিশেষেণৈব অমানবঃ পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্মলোকং উত কাংশ্চিদেব"

ইহার অর্থ :—

যাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপাতিরিক্ত বিকার (অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনোপ্রকার প্রাকৃত আবির্ভাব) অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন—সবাই কি তাঁহারা নির্ব্বিশেষে দিব্য পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন, অথবা—কেহ বা নীত হ'ন—কেহ বা হ'ন না?

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে,—

"প্রতীকালম্বনান্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বান্ অন্যান্ বিকারালম্বনান্ নয়তি ব্রহ্মলোকং।"

ইহার অর্থ :—

বিকারালম্বীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) প্রতীকো-পাসক অর্থাৎ প্রতিমাদি-পূজক এবং (২) সগুণব্রহ্মো-পাসক। বিকারালম্বীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতিমাদি পূজক তাঁহারাই কেবল ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন না; পরন্ত যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসক—সকলেই তাঁহারা ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন্।

ঐ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের সপ্তদশ সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে এই যে,—

"যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি কিং তেষাং নিরবগ্রহং ঐশ্বর্য্যং ভবতি আহোস্বিৎ সাবগ্রহং ।"

ইহার অর্থ এই :—

সগুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রসাদে যাঁহারা মনকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য কি সর্ব্বাঙ্গীন অথবা আংশিক ?

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে,

"জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যৎ অণিমাদ্যাত্মকং ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি। জগদ্‌ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈব ঈশ্বরস্য ।"

ইহার অর্থ :—

সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি জগদ্‌ব্যাপার ব্যতিরেকে অণিমাদি আর আর যতপ্রকার ঐশ্বর্য্য আছে—সমস্তই মুক্তপুরুষে বর্ত্তিতে পারে ;—জগদ্‌ব্যাপার কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই অধিকারায়ত্ত, তদ্ভিন্ন আর কাহারও অধিকারায়ত্ত নহে !

ঐ অধ্যায়ের উনবিংশ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে লেখে,—

"বিকারাবর্ত্ত্যপি চ নিত্যমুক্তং পারমেশ্বরং রূপং, ন কেবলং বিকারমাত্রগোচরং সবিতৃমণ্ডলাদ্যধিষ্ঠানং। তথাহ্যস্য দ্বিরূপাং স্থিতিমাহ আম্নায়ঃ। 'তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।' 'পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' ন চ তং নির্ব্বিকারং রূপং ইতরালম্বনা প্রাপ্নুবন্তীতি শক্যং বক্তুং। * * * যথৈব দ্বিরূপে পরমেশ্বরে নির্গুণং রূপং অনবাপ্য সগুণে অবতিষ্ঠন্তে এবং সগুণেঽপি নিরমগ্রহং ঐশ্বর্য্যং অনবাপ্য সাবগ্রহে এব অবতিষ্ঠন্তে ।"

ইহার অর্থ :—

নিত্যমুক্ত পারমেশ্বর (অর্থাৎ পরমেশ্বরীয়) রূপ শুধু যে সূর্য্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠান প্রভৃতি বিকারের (অর্থাৎ জগদ্‌ব্যাপারের) সহবর্ত্তী তা তো আর না ;—একদিকে যেমন তাহা বিকারের সহবর্ত্তী, আর একদিকে তেমনি তাহা নির্ব্বিকার। বেদে তাই ইহাঁর দুইরূপ স্থিতির উল্লেখ আছে ; যেমন—'ইহাঁর মহিমা এতদূর পর্য্যন্ত মহিমান্বিত পুরুষ তাঁহার মহিমা অপেক্ষা বড়', এই বেদবচনটিতে মহিমাতে স্থিতি এবং স্বরূপে স্থিতি দুইই সূচিত হইতেছে ; তথৈব 'ইহাঁর এক পাদ সমস্ত ভূত—ত্রিপাদামৃত দ্যুলোকে' এই আর-একটি শ্রুতি-বচনে জগদ্‌ব্যাপারের সহবর্ত্তিতা এবং অতিবর্ত্তিতা দুইই সূচিত হইতেছে। একথা বলিতে পার না যে, বিকারালম্বীরা (অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরের প্রাকৃত আবির্ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহারা) পরমেশ্বরের নির্ব্বিকাররূপে স্থিতি প্রাপ্ত হ'ন। সগুণ ব্রহ্মোপাসকেরা একদিকে যেমন পরমেশ্বরের নির্গুণরূপে স্থান না পাইয়া সগুণরূপে স্থিতি করেন, আর এক দিকে তেমনি তাঁহারা পরমেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত না হইয়া আংশিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হ'ন।

["সর্ব্বাঙ্গীন ঐশ্বর্য্য" কিনা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তৃত্ব—"আংশিক ঐশ্বর্য্য কিনা অণিমা লঘিমাদি অলৌকিক শক্তিসামর্থ্য] ।

ঐ অধ্যায়ের ঐ পাদের একবিংশ সূত্রের শঙ্করভাষ্যে তৃতীয় আর-একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে এই যে,

"ইতশ্চ ন নিরঙ্কুশং বিকারালম্বনানাং ঐশ্বর্য্যং যস্মাৎ ভোগমাত্রং এষাং অনাদিসিদ্ধেন ঈশ্বরেণ সমানং ইতি শ্রূয়তে * * * * 'যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্তি এবং হৈবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্তি * * * । নম্বেবং সতি সাতিশয়ত্বাৎ অন্তবত্বং ঐশ্বর্য্যস্য স্যাৎ ততশ্চৈষাং আবৃত্তিঃ প্রসজ্যেত ।"

ইহার অর্থঃ—

আর-একটি কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের ঐশ্বর্য্যকে নিরঙ্কুশ বলিতে পারা যায় না অর্থাৎ পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ বলিতে পারা যায় না। সে কারণ এই যে, বেদে কেবল বলে—উহাঁদের ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের সহিত ভোগবিষয়েই সমান, তা বই, এরূপ বলে না যে, উহাঁদের ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের সহিত কর্ত্তৃত্বাদি বিষয়েও সমান। তার সাক্ষী :—বেদে আছে 'সমুদায় ভূত দেবতাকে যেমন রক্ষা করে—উপাসককেও তেমনি রক্ষা করে' ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ ঐশ্বর্য্য যেহেতু ভোগবিষয়ক মাত্র, এই হেতু তাহা সীমাবচ্ছিন্ন। সীমাবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যের ভোগ কিছু আর অনন্তকাল চলিতে পারে না—তাহার অন্ত অনিবার্য্য। তবে কি ভোগাবসানে মুক্তপুরুষকে পুনর্ব্বার ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে ?

পরবর্ত্তীসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে,

"নাড়ীরশ্মিসমন্বিতেন অর্চ্চিরাদিপর্ব্বণা দেবযানেন পথা যে ব্রহ্মলোকং শাস্ত্রোক্তবিশেষণং গচ্ছন্তি—যস্মিন্ অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চ অর্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাং ইতো'দিবি যস্মিন্ ঐরম্মদীয়ং সরো যস্মিন্ অশ্বত্থঃ সোমসবনো যস্মিন্ অপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণো যস্মিংশ্চ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ং বেশ্ম যশ্চানেকধা মন্ত্রার্থবাদাদিপ্রদেশেষু প্রপঞ্চ্যতে তং তে প্রাপ্য ন চন্দ্রলোকাদিবৎ বিযুক্তভোগো আবর্ত্তন্তে। কুতঃ। 'তয়োর্দ্ধং আয়ন্ অমৃতত্বং এতি।' 'তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।' 'এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবং আবর্ত্তং ন আবর্ত্তন্তে।' 'ব্রহ্মলোকং অভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।' ইত্যাদি শব্দেভ্যঃ। অন্তবত্বেঽপি তু

ঐশ্বর্য্যন্ত যথা অনাবৃত্তিস্তথা বর্ণিতং 'কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরং' ইত্যত্র। সম্যগ্‌ দর্শনবিধ্বস্ততমসাং তু নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধা এব অনাবৃত্তিঃ। তদাশ্রয়ণেনৈব হি সগুণশরণানামপি অনাবৃত্তিসিদ্ধিঃ।"

ইহার অর্থঃ—

যাঁহারা নাড়ীরশ্মি সমন্বিত অর্চ্চি প্রভৃতি পংক্তি-বিভাগের মধ্য দিয়া দেবযান পথ অতিবাহন করিয়া শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মলোকে গমন করেন;—পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে যেখানে বিরাজ করিতেছে অরণ্য-নামক যুগল সমুদ্র, অন্নমদময় সরোবর, অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ, ব্রহ্মার অপরাজিতা পুরী এবং ব্রহ্মার নির্ম্মিত হিরণ্ময় প্রাসাদ—সেই ব্রহ্মলোকে যাঁহারা গমন করেন, সেখান হইতে তাঁহারা চন্দ্রলোকবাসীদিগের ন্যায় বিযুক্তভোগ হইয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তাহার প্রমাণ কি?—প্রমাণ তাহার—'উপাসকেরা উর্দ্ধে গমন করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হন', 'তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না' 'তাঁহারা মনুষ্যলোকে আবর্ত্তন করেন না', 'ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহারা পুনরাবর্ত্তন করেন না' এই সকল বেদবাক্য। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত ব্রহ্মোপাসকদিগের ঐশ্বর্য্য অন্তবান্‌ হইলেও সে-প্রকারে তাঁহাদের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নিবারিত হয় সে কথা পূর্ব্বের একটি সূত্রে বলা হইয়াছে—বর্ত্তমান অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দশমসূত্রে অর্থাৎ 'কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃপরং' এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মলোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সেই স্থানে অবস্থিতি-কালেই তত্রত্য অধিবাসীদিগের সম্যক্‌ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া গতিকে তাঁহাদের অধ্যক্ষ যিনি ব্রহ্মা তাঁহার সঙ্গে তাহারা একত্রে পরম পরিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ পরমস্থান প্রাপ্ত হ'ন। সম্যক্‌জ্ঞানের-উৎপত্তি-প্রসাদাৎ যাহাদের অজ্ঞানান্ধকার সমূলে বিধ্বস্ত হইয়াছে সেই নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণ মুক্ত পুরুষদিগের অনাবৃত্তি তো সিদ্ধই আছে; অতএব তৎপ্রসাদাৎ (অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞানের উৎপত্তিঃ প্রসাদাৎ) সগুণব্রহ্মোপাসকদিগেরও যে অনাবৃত্তি সিদ্ধ হইবে—তাহা তো হইবারই কথা।

মুক্তিবিষয়ে বেদান্তদর্শনের মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি সবিস্তরে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। তাহা সংক্ষেপে এই:—

প্রথম সিদ্ধান্ত।

পরমেশ্বরের স্থিতি দুইপ্রকার—(১) স্বরূপে স্থিতি এবং (২) মহিমাতে স্থিতি।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

(১) যে-ভাবে তিনি স্বরূপে স্থিতি করেন সে-ভাবে তিনি নির্গুণ, আর (২) যে-ভাবে তিনি আপনার মহিমাতে স্থিতি করেন সে-ভাবে তিনি সগুণ।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

প্রতীকোপাসনা অর্থাৎ প্রতিমাদি-পূজা ব্রহ্মোপাসনার কোটায় স্থান পাইবার অযোগ্য। *

* আমাদের দেশের অধম-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বিষয়ী লোকদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য সময়ে সময়ে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এইরূপ একটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা লোকমধ্যে রটনা করিয়া থাকেন যে, প্রতিমাপূজাও একপ্রকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। ইহাদের জানা উচিত যে, প্রতিমাপূজা ব্রহ্মোপাসনার কোটায় স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া শাস্ত্রকারেরা প্রতীকোপাসনার কোটায় তাহার জন্য স্বতন্ত্র একটা স্থান পরিচিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন।

* বর্ত্তমানকালের একজন মার্কিণদেশীয় যোগি ঋষি-শ্রেণীর মহাত্মা (Andrew Jackson Davis) Clairvoyance-সংজ্ঞক ধ্যানযোগের প্রভাবে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-ব্যাপারের যেরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা মোটের উপর আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের সহিত মেলে একরকম মন্দ না, পরন্তু তাহার অবান্তর শ্রেণীর বিষয়গুলা কতক বা ভাবে মেলে ভাষায় মেলে না—কতক বা কোনো অংশেই মেলে না। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে নিম্নে তাহার কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

After the individual souls leave this planet অর্থাৎ পৃথিবী (and all planets in universal space which yield such organizations of matter) they ascend to the Second Sphere of existence. Here all individuals undergo an angelic discipline, by which every physical and spiritual deformity is removed, and symmetry reigns hroughout the immeasurable empire of holy beings. When all spirits shall have progressed to the second sphere, the various earths and planets in the Universe * * * will be depopulated and not a living thing will move upon their surfaces. And so there will be no destruction of life in that period of disorganization, but the earths and suns and planets will die—their life will be absorbed by the Divine Spirit. * * * But the inhabitants of the second sphere will ultimately advance to the third, then to the fourth, then to the fifth, and lastly into the sixth; this sixth sphere is as near the Great Positive Mind as spirits can ever locally or physically approach. * * * It is in the neighbourhood of the divine aroma of the Deity; it is warmed and beautified infinitely by His infinite Love, and it is illuminated and rendered unspeakably magnificent by His all-embracing Wisdom. In this ineffable sphere in different stages of individual progression, will all spirits dwell.

* * * *

When all spirits arrive at the sixth sphere of existence, and the protecting Love and Wisdom of the great positive Mind are

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিপ্রাপ্ত সম্যক্‌জ্ঞানীদিগকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তো হয়ই না, তা ছাড়া—সগুণব্রহ্মের উপাসকদিগকেও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত।

ইহলোকেই হউক্ আর পরলোকেই হউক—যখনই যাঁহাতে সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখনই তিনি মুক্ত হ'ন।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

সগুণ ব্রহ্মোপাসকেরা ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন; আর সেখানে অবস্থিতি-কালে—একদিকে যেমন জগদ্ব্যাপার ব্যতীত আর আর সমস্ত ঐশ্বর্য্য (যেমন অণিমাদি ঐশ্বর্য্য) তাঁহাদের করায়ত্ত হয়; আর এক দিকে তেমনি তাঁহাদের অন্তরে সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞানের কপাট উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, আর, সেইগতিকে তাঁহারা মুক্ত হ'ন।

---

thrown tenderly around them; and when not a single atom of life is wandering from home in the fields and forests of immensity; then the Deity contracts his inmost capacity, and forthwith the boundless vortex is convulsed with a new manifestation of Motion—Motion transcending all our conceptions, and passing to and fro from centre to circumference, like mighty tides of Infinite Power. Now the law of Association or *gravitation* exhibits its influence and tendency in the formation of new suns, new planets, and new earths. The law of progression or *refinement* follows next in order and manifests its unvarying tendency in the production of new forms of life on those planets; and the law of development follows next in the train, aud exhibits its power in the creation of *new* planets, animals, and human spirits upon every earth prepared to receive and nourish them. Thus God will create a new Universe, and will display different and greater elements and energies therein. And thus new spheres of spiritual existences will be opened. These spheres will be as much superior to the present unspeakable glories of the sixth sphere, as the sixth sphere is now above the second sphere; because the highest sphere in the present order of the Univer e will constitute the second sphere in the new order which is to be developed.

There have already been developed more new Universes, in the manner described, than there are atoms in the earth.

[নোট সমাপ্ত।

সপ্তম সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মলোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাদের অধ্যক্ষ যিনি ব্রহ্মা তাঁহার সহিত একত্রে পরম পরিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরমপদ কিনা পরমধাম প্রাপ্ত হ'ন।

বেদান্তদর্শনের শেষের এই সিদ্ধান্তটির সম্বন্ধে আমার মনে দুইটি গুরুতর প্রশ্ন সহসা উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ যদি প্রকৃত পক্ষেই নির্ব্বাণ হয়, আর সেই কারণে যদি ব্রহ্মা প্রলয়কালে তাঁহার ব্রহ্মলোকবাসী সহচরদিগের সহিত একত্রে বিষ্ণুর পরমপদে উপনীত হইয়া একবারেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন, তবে ব্রহ্মার অবর্ত্তমানে প্রলয়ান্তে নূতন সৃষ্টির কার্য্য চলিবে কাঁহার অধ্যক্ষতায়?

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পক্ষান্তরে এমন যদি হয় যে, ব্রহ্মনির্ব্বাণের প্রশান্ত অবস্থাতেও মুক্তপুরুষের জ্ঞান প্রেমাদি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম অবিচ্যুত থাকে, আর, সেই কারণে যদি—প্রলয়কালে ব্রহ্মা এবং তাঁহার ব্রহ্মলোকবাসী সহচরেরা বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হ'ন, তবে প্রলয়ান্তে আবার যখন ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের (অবশ্য নূতন সৃষ্ট ব্রহ্মলোকের) আধিপত্যকার্য্যে ব্রতী হ'ন, তখন তাঁহার পুরাতন ব্রহ্মলোকবাসী সহচরেরা তাঁহার সঙ্গে একত্রে নূতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত না হইবেন যে, কেন, তাহার কোনো অর্থ থাকে না। রজনী অবসানে রাজা যেমন রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন—মন্ত্রীও তেমনি মন্ত্রণাকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন—রাজদূতও তেমনি দৌত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—চাষাও তেমনি চাষকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; নচেৎ রাজ্যের প্রজারা যদি স্ব স্ব অধিকারোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তবে রাজা রাজকার্য্য করিবেন কাহাদিগকে লইয়া? জনশূন্য রাজ্যের রাজাই বা কিরূপ রাজা? ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকবাসী সহচরদিগের অবর্ত্তমানে ব্রহ্মলোক যদি জনশূন্য হয়, হয়, তবে সেরূপ ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মাতেই বা কি কাজ, আর, বর্ত্তিয়া থাকিয়াই বা কি কাজ?

প্রশ্ন। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তোমার প্রশ্ন-দুটার একটা সদুত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ক্ষান্ত থাকিবে? তা চেয়ে—স্পষ্ট বল না কেন যে, কোনো জন্মেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তোমাকর্ত্তৃক ঘটিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের দেশীয় বেদান্ত-

বাগীশ মহাশয়েরা তোমার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবেন?—হরি হরি! তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? হইবে যাহা—তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতেছি;—তুমি শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছ দেখিয়া দেশসুদ্ধ সমস্ত শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ তোমার প্রতি খড়্গহস্ত হইবেন। তবে যদি তুমি রামানুজাচার্য্য বা ঐরূপ কোনো লোকপূজ্য আচার্য্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে তাহা হইলে তুমি অনেকানেক পণ্ডিতের নিকট হইতে অনেক প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিতে—সেটা সত্য।

উত্তর॥ শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আমার স্বপক্ষসমর্থনের জন্য শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত বিবেকচূড়ামণি এবং সর্ব্ববেদান্তসার হইতে গণ্ডাগণ্ডা বহুমূল্য বচন যাহা আমি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার একটিও আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না। শঙ্করাচার্য্যের মতো অতবড় একজন তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্য কি কেহ কোথাও দেখিয়াছে না দেখিবে? কি অকৃত্রিম সত্যানুরাগী। পাণ্ডবসেনার মধ্যে যেমন অর্জ্জুন অদ্বিতীয়, সত্যের সেনার মধ্যে তেমনি শঙ্করাচার্য্য অদ্বিতীয়। আমি আবার শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করিব? আমি তাঁহার বিন্দুমাত্র পদধূলি পাইলে বর্ত্তিয়া যাই। আমার বিশ্বাস এই যে, যাহাকে আমি বলিতেছি "কঠোর অদ্বৈতবাদ" তাহা কেবল শঙ্করাচার্য্যের মতের একটা বাহিরের পরিচ্ছদ, তা বই, তাহা শঙ্করাচার্য্যের মতের ভিতরের কথা নহে। শঙ্করাচার্য্যের ভিতরে মহা এক অদ্বিতীয় সত্য জাগিতেছে; এম্নি তাহা অপ্রতিম—এম্নি অপরিমেয়—এম্নি অতলস্পর্শ গভীর যে, তাহা মুখেও ব্যক্ত করা যায় না—লেখনীতেও ব্যক্ত করা যায় না, বলিয়াও বুঝানো যায় না, গড়িয়াও দেখানো যায় না। যাহা মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব সেই কথাটি পাকে প্রকারে ইঙ্গিত ইসারায় ব্যক্ত করিতে গিয়া তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কঠোর অদ্বৈতবাদ। শঙ্করাচার্য্য এই যে একটি কথা বলিয়াছেন —যে,

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাৎ সুনির্ম্মলং
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ॥"

"নির্ম্মলীফলের গুঁড়া যেমন জলের সমস্ত মলরাশি নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান তেমনি জীবের অজ্ঞানকলুষ নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়," এ কথাটির নিগূঢ় অর্থ আমি যতদূর বুঝি তাহা এই :—

শঙ্করাচার্য্যের ভিতরে যে কথাটি জাগিতেছে তাহা যদি তিনি মুখে প্রকাশ করিয়া না বলেন, তবে তাহা তাঁহার ভিতরেই থাকিয়া যায়। যদি তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন তবে তাহা কঠোর অদ্বৈতবাদের আকারে পরিণত হয়। সেই ভিতরের ভাবটির প্রতি লোকের দৃষ্টির আকর্ষণ করিতে হইলে অদ্বৈতবাদের নিশান খাড়া করা ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর নাই। লোকে কথায় বলে "নেই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল।" শঙ্করাচার্য্যের ভিতরের কথাটি একেবারেই তাঁহার ভিতরে থাকিয়া যাওয়া অপেক্ষা অদ্বৈতবাদের আকারে তাহা লোকমধ্যে প্রচারিত হওয়া ভাল। এখন কথা হইতেছে এই যে, অদ্বৈতবাদ দিব্য একটি চাঁছা-ছোলা মত এইজন্য তাহা লোকের জ্ঞানের উপলব্ধিগম্য; পরন্তু শঙ্করাচার্য্যের ভিতরের কথাটি যেহেতু অনির্ব্বচনীয় এই হেতু তাহা জনসাধারণের উপলব্ধিগম্য নহে। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে তোমার অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হইলে সেই সঙ্গে তোমার অদ্বৈতজ্ঞানও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিনাশ পাইবে যেন অদ্বৈতজ্ঞান—উৎপন্ন হইবে কিরূপ জ্ঞান? যদি বলো—কিছুই উৎপন্ন হইবে না—যাহা অনাদিকাল বর্ত্তমান আছে তাহাই অবিদ্যামুক্ত হইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি—যাহা অবিদ্যামুক্ত হইবে তাহা জ্ঞান কি অজ্ঞান? তাহা যদি জ্ঞান হয়, তবে, এই যে তুমি বলিলে "জ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হইবে" তোমার এ কথাটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া যায়। আমি তাই বলি এই যে, চরমে যেরূপ জ্ঞান অবিদ্যামুক্ত হইয়া বিরাজমান হইবে, তাহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া তাহা যে কিরূপ জ্ঞান, তাহা কাহাকেও বুঝানো যাইতে পারে না; আর, তাহা বুঝানো যাইতে পারে না বলিয়া শঙ্করাচার্য্য তাহা কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা না করিবার এটাও একটা কারণ—যে, সে জ্ঞান যাহার যখন উৎপন্ন হইবে, তখন, তাহা যে কিরূপ জ্ঞান, তাহা তিনি আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবেন; তাহার পূর্ব্বে তাহা অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে বুঝিয়া লইতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা। এ যাহা আমি বলিলাম তাহার একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা নিতান্তই আবশ্যক মনে করিতেছি; কেননা তাহা যদি আমি না করি, তবে, আমার মন বলিতেছে যে, শ্রোতারা আমার ঐ কথাটির তাৎপর্য্য এক বুঝিতে আর বুঝিবেন।

জ্যামিতি-পুস্তকের গোড়াতেই সরল রেখার সংজ্ঞা নিরূপণ করা হইয়াছে। একটি সংজ্ঞা এই যে, যে রেখা দুই প্রান্তবিন্দুর মধ্যে সরলভাবে অবস্থিতি করে তাহাকেই বলা যায় সরল রেখা। এ সংজ্ঞা সংজ্ঞাই নহে। আর একটি সংজ্ঞা এই যে, দুই বিন্দুর মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম পথ তাহাই সরল রেখা। এটা তো

সংজ্ঞা নহে—এটা সিদ্ধান্তবিশেষ; কেননা দুই বিন্দুর মধ্যস্থিত হ্রস্বতম রেখা সরল কি বক্র তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। প্রকৃত কথা এই যে, সরল রেখার সংজ্ঞা হয় না—অথচ জোর করিয়া তাহার সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে। আর একদিকে দেখা যায় যে, সরল রেখা যে কাহাকে বলে, তাহা অধম মূর্খ লোকেরাও জানে। তার সাক্ষী—কোনো একজন গাড়োয়ান্ যখন গাড়ী সজোরে ঠেলিয়া স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করে—তখন সে সরল-রেখাপথে বলপ্রয়োগ করে। প্রকৃত কথা এই যে, সরল রেখা একপ্রকার মানসিক রেখা—তাহা বলস্ফূর্ত্তিরই আর এক নাম; সুতরাং তাহার দৈশিক সংজ্ঞা অসম্ভব। এখানেও নেই-মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল—সরল রেখার সংজ্ঞা নিরূপণ না-করা অপেক্ষা ছাত্রদিগের উপকারার্থে মোটামুটি তাহার একটা সংজ্ঞানিরূপণ করা ভাল। চরম ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ জ্ঞান তাহার সংজ্ঞা নির্ব্বাচন যদিচ অসম্ভব কিন্তু তাহা যে কিরূপ জ্ঞান নহে, তাহা বলিতে পারা কিছুই কঠিন নহে। শঙ্করাচার্য্য বলিতে পারিতেন যে, চরম ব্রহ্মজ্ঞান দ্বৈতজ্ঞানও নহে—অদ্বৈত জ্ঞানও নহে; তাহা তিনি বলেন নাই কেবল এই জন্য—যেহেতু "অদ্বৈতজ্ঞান নহে" বলা তাঁহার মুখে শোভা পায় না; তা ছাড়া—"দ্বৈতও নহে অদ্বৈতও নহে" এরূপ একটা হেঁয়ালি ধরণের কথা দর্শন-শাস্ত্রে স্থান পাইবার অযোগ্য। হেঁয়ালিধরণের কথা দর্শনশাস্ত্রে যদিচ শোভা পায় না, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে তাহা খুবই শোভা পায়; কেননা তন্ত্রশাস্ত্রের আগাগোড়া সবই হেঁয়ালি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শিব যেখানে চুলুচুলু চক্ষে বলিতেছেন

> "অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
> মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতং ॥"

"কেহ বা অদ্বৈত ইচ্ছা করেন, কেহবা দ্বৈত ইচ্ছা করেন, কিন্তু আমার এই যে তত্ত্ব—দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত, এ তত্ত্ব কেহই জানে না" সেখানে শিবের ঐ নির্ঘাত বচনটি শিবের মুখে শোভা পাইয়াছে দিব্য মনোহর। এসম্বন্ধে প্রকৃত কথা যাহা দ্রষ্টব্য তাহা আমি পূর্ব্বে একস্থানে প্রকারান্তরে বলিয়াছি; তাহা এই যে—

অদ্বৈতজ্ঞান দ্বৈতগর্ভ এবং দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈতের অন্তর্ভুক্ত।

বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের শাঙ্করভাষ্যে এই যে দুইটি উপনিষদ্ বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে—(১) "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" অর্থাৎ "ইহার মহিমা এতদূর পর্য্যন্ত—মহিমান্বিত পুরুষ তাঁহার মহিমা অপেক্ষা বড়", (২) "পাদোঽস্য সর্ব্বাণি ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অর্থাৎ "ইহার একপাদ সমস্ত ভূত—ত্রিপাদামৃত দ্যুলোকে", এই দুইটি বচনের মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিয়া দেখিলে—পরমেশ্বর যে সগুণ এবং নির্গুণ দুইই একাধারে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, আর, সেই সঙ্গে যুক্তিবিষয়ক তথ্যনিরূপণের বাকি পথ সুপরিষ্কৃত হইয়া যাইবে। কিন্তু আজ আর না—যুক্তিবিষয়ে আর কয়েকটি কথা যাহা আমার বলিবার আছে—আগামী অধিবেশনে তাহার পর্য্যালোচনায় বিধিমতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মেটারলিঙ্ক।

ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্য এমনি এক নূতনতর ব্যাপার, গত পনের বিশ বৎসরের মধ্যে তাহার এতই বদল হইয়া গেছে, যে তাহার ভাবখানা যে কি ও তাহার ধারা যে কোন্ দিকে চলিয়াছে পরিষ্কার করিয়া দেখানো বড় শক্ত। বিশ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যে এত বেশি জনতা ছিলনা; এখন শুধু লোকের ভিড় নয় ভাবের ভিড়ই তাহার চেয়ে শতগুণ অধিক। তখন সমতলে দাঁড়াইয়া উজ্জল দিবালোকে গোটাকতক মাথালো মাথালো গিরিশৃঙ্গ দেখা যাইত—লোকে নীচে থাকিয়া তাহাদের উচ্চতার পরিমাপ করিত। ভাব, কল্পনা, সৌন্দর্য্য, রহস্য সমস্তই সুগম্ভীর ও নিবিড় অথচ সমস্তই কি পরিষ্কার ও ভরাট্! এখন যেন পাহাড়ের শ্রেণীর মধ্যে থাকিয়া সাহিত্যকে দেখিতে হইতেছে—পর্ব্বতের পর পর্ব্বত তাহার আর অন্ত নাই। তাহাতে আবার সময় রাত্রি। যদিও দিব্য জ্যোৎস্না রহিয়াছে, তথাপি কিছুই স্পষ্ট নয়—পাহাড়ে উপত্যকায় আলোয় ছায়ায় জড়াইয়া এক পাহাড়কেই পাঁচ পাহাড় এবং পাঁচ পাহাড়কেই পঁচিশ পাহাড় বলিয়া মনে হয়। এক ভাবের মধ্যে নানাভাবের মিশল—তাহার কোথায় যে সুরু আর কোথায় যে শেষ, তাহার কি যে নিহিতার্থ আর কি যে অভিব্যঞ্জনা তাহা অনুসরণ করিতে যাওয়া যেন জলের উপর চাঁদের প্রতিবিম্বকে ধরিতে যাইবার মতো। ধরিতে গেলেই তাহা পালায়। সুতরাং এই পর্ব্বতলোকের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলে ঘোরাটাই হয় মাত্র—কে যে কি তাহা জানা হয় না এবং কোনো ভাবের পরিষ্কার পরিমাপ হয় না। এ যেন স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবার মতো।

এত অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যের এমনতর পরিবর্ত্তনকে অভাবনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অভাবনীয় বলি কেন? এ যুগের মানুষ যে সম্পূর্ণরূপে এক নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে। সে ছিল ক্ষুদ্রদেশে ও ক্ষুদ্রকালে নানা কৌলিক ও দৈশিক সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ। হঠাৎ সে বিশাল জগতে ও ব্যাপ্ত কালের মধ্যে ছাড়া পাইয়াছে এবং নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব ও নূতন অনুভূতি সকল তাহার পুরাতন সংস্কারের স্থানে আপনাদের দখল জানাইয়াছে। ভাব অনেকদিন পর্য্যন্ত থিতাইয়া সংস্কারের মত সুদৃঢ় সুপরিণত ও সুনিশ্চিত না হইলে সাহিত্যে কি তাহাকে রূপ দান করা যায়? যাহা ক্রমাগতই পরিবর্ত্তনের মুখে আবর্ত্তিত হইতেছে, যাহা কোন স্থায়ী আকার লাভ করে নাই, নানা সঙ্গতি-সূত্রে নানা জিনিসের সহিত বাঁধিয়া যায় নাই, তাহাকে সাহিত্যে চিত্রিত করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। কিন্তু সেই অসম্ভব কার্য্যেই আধুনিক সাহিত্য হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সেইজন্য পূর্ব্বের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ এরূপ আত্যন্তিক হইয়াছে।

"আধুনিক কালে আমাদের সংস্কার ভাব ও অনুভাব সকলের মধ্যে যে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় তদপেক্ষা বিস্ময়কর আর কিছুই নাই। এই বিশৃঙ্খলায় আমরা এমন কতগুলি অনুভাব দেখিতে পাই,—যাহারা বাস্তবিকই এখনকার কালের জ্ঞানানুমোদিত ভাবের একেবারেই অনুগামী নহে—যেমন ধর, সুনির্দ্দিষ্ট, ব্যক্তিগত, সীমাবদ্ধ ঈশ্বরের ধারণা। আবার কতগুলি অনুভূতি আছে যে গুলি অর্দ্ধেক আইডিয়ার আকার লাভ করিয়াছে—যেমন ধর নিয়তির সম্বন্ধীয় ধারণা। আবার আমরা এমন কতগুলি ভাব দেখিতে পাই যাহারা ক্রমেই অনুভূতির ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে—যেমন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, অভিব্যক্তি, বংশের বা জাতির ইচ্ছা ইত্যাদি। আরও অনেক ভাব আছে, কিন্তু সেগুলি এখনও মানুষের হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায় নাই, এখনও অনিশ্চিত ও বিক্ষিপ্ত রহিয়া গিয়াছে।"

উপরে যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম তাহা একজন আধুনিক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের লেখার অনুবাদ। সাহিত্যের যে নব পরিবর্ত্তনের কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাঁহার এই উদ্ধৃত রচনা তাহা সমর্থন করে। যে "বিশৃঙ্খলা"র কথা তিনি বলিতেছেন, তাহাকেই তিনি তাঁহার সাহিত্যে শৃঙ্খলায় পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগী। আমি আধুনিক সাহিত্যজগতকে এক গিরিমালার সঙ্গে তুলনা করিয়াছি; ইনি তাহারি মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বোচ্চ গিরি—শুভ্র তুষারের রাজমুকুট ইঁহারি মস্তকে শোভা পাইতেছে। এবং জ্যোৎস্না নিশীথে এই গিরিশ্রেণীর মধ্যে আলোছায়ার উচ্চতার নীচতার জড়িতভাবের যে বিভ্রমের কথা বলিয়াছি, ইঁহার পাদদেশে তাহার কিছুকিছু পরিচয় পাইলেও যতই উর্দ্ধে উত্থিত হইব, ততই হরজটায় শোভিত চন্দ্রকলার ন্যায় রহস্যের অন্তর্নিহিত সুস্পষ্ট সত্য ও সৌন্দর্য্য আমাদের নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে। এই আধুনিক লেখকটির নাম মেটারলিঙ্ক। আজ ইঁহারি রচনা ও বাণী সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে চাই।

মেটারলিঙ্ক প্রধানত নাট্যকার বলিয়া খ্যাত। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি এমনি ছায়া-ছায়া স্বপ্নময়, এমনি বাষ্পের দ্বারা তৈরি লোকের মত যে কে বলিবে তাহার ভিতরে কোন গভীর তাৎপর্য্য বিরাজ করিতেছে! "রঙ্গমল্লী"র গ্রন্থকার কবি সত্যেন্দ্র ইঁহার একটি নাটক—The sightlessএর (দৃষ্টিহারা) অনুবাদ করিয়াছেন। দশ বৎসরের পূর্ব্বে যখন প্রথম সেই নাটকটি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন তাহার ভিতরে যে কোন অর্থ আছে তাহা মনেই হয় নাই। তারপর কিছুকাল পরে পুনরায় একবার পাঠ করি, তখন যে অর্থ মনে হইয়াছিল অধুনা হেন্‌রিরোজের সমালোচনা পড়িয়া দেখিতেছি সে একেবারেই ঠিক অর্থ নহে। "দৃষ্টিহারা" মেটারলিঙ্কের অল্প বয়সের রচনা, কিন্তু অধিক বয়সে তিনি যে সকল নাটক লিখিয়াছেন যেমন 'ব্লুবার্ড' তাহাও যে বেশ পরিষ্কার অর্থজ্ঞাপক হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। সেইজন্য মেটারলিঙ্ককে "মিষ্টিক" অর্থাৎ দুর্ব্বোধ জাতীয় লেখক, এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

আধুনিক সাহিত্যরথিগণ প্রায়ই সব্যসাচী—তাঁহারা একই সময়ে গদ্য ও পদ্য এই উভয় রচনার তীর চালনা করিতে সুনিপুণ। সেইজন্য তাঁহাদিগকে আর সমালোচকের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের টীকা লেখেন, নিজেরাই নিজেদের রস বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। যখন নাটক লেখেন বা কবিতা লেখেন, তখন তাঁহারা কালিদাস; যখন প্রবন্ধ লেখেন বা তত্ত্বালোচনা করেন তখন তাঁহারা মল্লিনাথ। কবিতাতে বা নাটকে যাহা অখণ্ড ও অনির্ব্বচনীয় রসে প্রকাশ করেন, সেই একই জিনিস আবার গদ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করেন। উভয়ক্ষেত্রে বস্তু স্বরূপতঃ একই, প্রকাশ কেবল বিভিন্ন। এই একটি আশ্চর্য্য সুবিধা আধুনিক লেখকগণের ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয় নাই। তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগের সত্য ও সৌন্দর্য্য অনেকটা পরিমাণে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছেন।

মেটারলিঙ্কের নাটক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা তাঁহার গদ্যগ্রন্থসকল পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, মেটারলিঙ্ককে তাঁহারাই ঠিকমত ধরিতে পারিবেন

বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাঁহার "Wisdom and Destiny" বা "Buried Temple" পড়িলে তাঁহার যে-কোন নাটকের ভিতরকার তাৎপর্য্যের রত্নাগারের চাবিটি পাওয়া যায়। দেখা যায় যে মেটারলিঙ্কের নাটকগুলি অধ্যাত্মজীবনের বিচিত্র-নিগূঢ় অবস্থা ও অভিজ্ঞতার বিবৃতি। যে সকল সমস্যা ও বাধা এই জীবনের প্রকাশকে অবরুদ্ধ করে, যে সকল পরীক্ষা ইহার সম্মুখে উপস্থিত হয় ও তাহাদিগকে অতিক্রম করিবার জন্য যে সংগ্রাম জাগে, এবং পরিণামে যে আনন্দ, শান্তি ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যদৃষ্টি লাভ হয়—মেটারলিঙ্ক সেই সকল অবস্থা ও অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া এক অদ্ভুত নাট্যকলার ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাট্যে কোন বাহিরের ঘটনা নাই, বিশেষ কোন কাহিনী নাই বলিয়া সাধারণ লোকের ঔৎসুক্য জন্মে না। বিশেষ অনুধাবন করিয়া না দেখিলে যে গভীরতর অধ্যাত্মজীবনের নিগূঢ় সকল অভিজ্ঞতা ও অবস্থার বিবৃতি ইহাতে আছে বলিতেছি তাহাও আবিষ্কার করা কঠিন হয়। তবে যাঁহারা মেটারলিঙ্কের গদ্যরচনা পাঠ করিয়া ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার নাট্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা আর অলস ও উদাসীন ভাবে ইহার পাতা উল্টাইতে পারেন না। তাঁহারা দেখেন প্রত্যেক কথাটি অর্থপূর্ণ। তাঁহারা এই নাট্যে একটা চিন্তার ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের ঔৎসুক্যও সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে যখন পরিণামে আসিয়া পৌছান যায় তখন অঙ্কে অঙ্কে যে সকল সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত অল্পে অল্পে জমিয়া উঠিয়াছে তাহাদিগকে এক চূড়ান্ত জায়গায় আসিয়া সমাপ্ত হইতে দেখা যায়। তখন কে বলিবে যে, কোন ঘটনাবহুল নাটকের অপেক্ষা এই শ্রেণীর নাটক কোন অংশে হীন।

মেটারলিঙ্কের কোন রচনার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে প্রথমে দেখা যাক্ তাঁহার বিশেষ বাণীটি কি। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন: "আমরা যাহা জানি যদি তাহারি দ্বারা আপনাদিগকে বেষ্টিত করিয়া রাখিতাম; অজ্ঞাত অপেক্ষা জ্ঞাত লোক অধিক মূল্যবান—এই বিশ্বাস যদি আমাদের মনে মনে থাকিত তবে আমাদের জীবনের তাৎপর্য্য কতই সামান্য হইত! এই যে একটি অজ্ঞাতের চেতনার মধ্যে আমরা নিয়ত বাস করি ইহাই আমাদের জীবনকে অর্থযুক্ত করিয়াছে।" এই যে আমাদের জীবনকে ঘিরিয়া একটি অজানা রহস্য বিরাজমান, ইহাই মেটারলিঙ্কের আসল বাণী। শুধু তাহাই নয়, মেটারলিঙ্ক মনে করেন যে এই কথাটিই এ যুগের সকলের চেয়ে বড় কথা—সকল কথার অন্তর্নিহিত কথা। দেখা যাক্ এই অজ্ঞাত রহস্য বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার নাটকে ইহাকে তিনি কেমন করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

মেটারলিঙ্ক যে একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি—জানি না সে কথাটি আমার পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই অবগত আছেন কি না। তাঁহার একটি পরম সুন্দর পুস্তক আছে, তাহার নাম "মৌমাছির জীবন" (The life of the Bee)। প্রায় বিংশতি বৎসর কিম্বা তাহারো অধিক কাল হইবে, তিনি এই মৌমাছি জীবটিকে বিশেষ আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃতির যে সকল আশ্চর্য্য ও গোপন দিক্ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন তাহা পড়িলে মনে হয় যেন পৃথিবীমাতার শ্যামল প্রাসাদের এক অনাবিষ্কৃত পুরী হঠাৎ তাঁহার নয়ন সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে! সে এক নূতন "রাণীর" দেশ—সেখানকার এক নূতন ইতিহাস! কবি যেন আলাদীনের প্রদীপ খানি হাতে পাইয়াছেন—দ্বারের পর দ্বার খুলিয়া যাইতেছে এবং নব নব বিস্ময় আবির্ভূত হইতেছে। পৃথিবীর বুকের ভিতরকার এমন সুমধুর রূপকথা আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

সেই জন্য যখন মেটারলিঙ্ক জীবনের চারিদিক ঘিরিয়া এক অজানা রহস্য বিরাজ করিতেছে এই কথাটি বলেন, তখন তাঁহার সেই কথাটিকে ভাবকুহেলিকা মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কেবল "মৌমাছি"র তত্ত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার কথায় সত্য আছে ও তাহা নির্ভরযোগ্য বলিতেছি তাহা নহে। এ যুগে এমন আর দ্বিতীয় কোন সাহিত্যিকের নাম আমার মনে পড়ে না: যিনি মেটারলিঙ্কের মত বিজ্ঞানের সকল প্রণালী ও ফলাফলকে এমন নিশ্চিন্ত সাহসের সহিত সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। মেটারলিঙ্কের নাটক পড়িয়া যাহারা তাঁহাকে "মিষ্টিক" বলে, তাঁহার গদ্য পাঠ করিয়া ও তাঁহার ভিতরে গভীরতর রূপে প্রবেশ করিয়া তাহারা যদি বা সে মত পরিবর্ত্তন না করে, অন্তত "মিষ্টিক" কথাটার ললাটে "বৈজ্ঞানিক" বিশেষণটা নিশ্চয়ই জুড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে।

বিজ্ঞানের আলোচনায় অধুনা আমাদের জীবনের সকল বিভাগে একটা বড় পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে বলিয়া মেটারলিঙ্ক এক নিমেষের জন্যও ভীত নহেন। তিনি বলেন, মানুষ এতদিন পর্য্যন্ত যে অনন্তের উপাসনা করিয়াছে সে কেমন অনন্ত? সে এক না-যায়-ধরা না-যায়-ছোঁওয়া সকলের অতীত সত্তা আর তাহার জন্য বুদ্ধিকে অপমানিত করিয়া ও প্রকৃতিকে খর্ব্ব করিয়া দুমড়ান কাগজের গোলার মত জীবনটাকে মানুষ ক্রমা-

গতই তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়াছে। মনে করিয়াছে জীবনটাকে যত সংক্ষিপ্ত করা যাইবে, সেই কাল্পনিক অনন্ত বুঝি ততই প্রসার লাভ করিবে। এই যে অনন্তকে পাইবার যত ভ্রান্ত প্রণালী—প্রাকৃতের চেয়ে অতিপ্রাকৃতের উপর অধিকতর বিশ্বাস—বৈজ্ঞানিক যুগে যদি ইহা ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে তবে খেদ কিসের! অমনি ইহাতে মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া যাইবে, রহস্যবোধ একেবারে দূর হইবে এমন মনে করিবার কোন হেতু আছে কি? মেটারলিঙ্ক বলেন "আমাদের অজ্ঞতার পূর্ব্বে যে রহস্য আমাদের কাছে দেখা দিয়াছিল এবং জ্ঞানলাভের পরে যাহা পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছে—এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট বিদ্যমান।" তিনি বলেন রহস্য তো কখনই অন্তর্হিত হইবার নহে—সে স্থান পরিবর্ত্তন করে মাত্র; জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নবতর রূপ লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব্বকালে মানুষ রহস্যের সম্মুখীন হইতে ভীত হইত, তাহাকে কেমন একটা দূর আকস্মিক, ও অদ্ভুত জিনিস মনে করিত—সে যেন দেবতার মত অপরিমেয় স্থির ও গম্ভীর—আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগ নাই, আমাদের কল্পনা তাহাকে নব নব রাগে রঞ্জিত করিতে পারে না—সে স্থিত, অচঞ্চল, চিরন্তন। রহস্যের এই স্থিতিশীল ভাব পূর্ব্বকালের সকল ধর্ম্মের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু এই ভাব কি চিরকাল মানুষের মনের উপর সমান আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে? কিছুকাল পরে বিশ্বরহস্যের প্রতিরূপ এই স্থিতিশীল দেবতার দল চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া বিস্মৃতির কোন্ অতল গভীরতার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে দেখা যায়! অথচ বিজ্ঞান যখন রহস্যকে পুনরায় সোনারকাঠি স্পর্শ করিয়া জাগায়, তখন দেখিতে পাই তাহার রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যে রহস্য পূর্ব্বে স্থিতিশীল, ভয়ের দ্বারা দূরনিহিত, ও আকস্মিক ছিল—সে এখন জীবন্ত ও সচল, সে এখন আত্মীয় ও নিকট, তাহার কিছুই আকস্মিক নহে, সে সমস্ত জীবনকে ছাইয়া আছে। অনন্ত যদি অন্তবিশিষ্টের ভিতরে না দেখা দেন, জীবনের সকল অংশে যদি তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ না হয়, তবে সেই সকলের অতীত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডছাড়া, কাল্পনিক অনন্ত লইয়া মানুষের লাভ কি?

মেটারলিঙ্কের "The Sightless" অর্থাৎ "দৃষ্টিহারা" সম্বন্ধে গত বৎসরের পত্রিকায় আমি আলোচনা করিয়াছিলাম—এখানে পুনরায় তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে আমার সেই প্রবন্ধের পাঠকবর্গের নিকটে পুনরুক্তিদোষে দোষী হইব। তবে বোধ হয় মোটামুটি ভাবে তাহার প্রসঙ্গ অবতারণা করিলে তাঁহারা বিরক্ত হইবেন না।

"দৃষ্টিহারা" একটি ক্ষুদ্র নাটিকা—মেটারলিঙ্কের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা। নাট্যের পাত্রপাত্রী সকলেই অন্ধ এবং দৃশ্য একটি অরণ্যময় দ্বীপের মধ্যে। সময় মধ্যরাত্রি। অন্ধেরা একটা মঠ হইতে আসিয়াছে, একজন পুরোহিত তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেছিলেন—হঠাৎ অন্ধেরা আর তাঁহার সাড়া পায় না। তাহারা জানিতে পারে নাই যে পুরোহিত তাহাদের মধ্যেই মরিয়া পড়িয়া আছেন।

আধুনিক যুগে মানুষ যে কি ভীষণ ধর্ম্মসঙ্কটের মধ্যে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে—নাট্যটি রূপকচ্ছলে তাহাই প্রদর্শন করিতেছে। ইউরোপে প্রচলিত চর্চ্চের ধর্ম্ম মানুষকে 'দৃষ্টিহারা' করিয়াছে এবং ধর্ম্মের চিরকালের আশ্রয় হইতে দূর করিয়া নূতন পথে নূতন সত্যের সন্ধানে বাহির করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন পুরোহিতই এই অন্ধদলের পথপ্রদর্শকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়, তিনি জানিতেন না যে তাঁহার শক্তি নিঃশেষিতপ্রায়। নূতন পথে যাত্রায় বাহির হইয়াই তিনি মারা গিয়াছেন; অথচ দৃষ্টিহারার দল তাহা জানিতেও পারে নাই। তাহারা কাহারও সাড়া না পাইয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছে—দূরে সমুদ্রের ধ্বনি—অজ্ঞাত রহস্যের সুর—তাহাদের কর্ণে পৌঁছিতেছে—তাহাদের জীবনদ্বীপের চতুর্দ্দিকেই এক অনন্ত অনাবিষ্কৃত রহস্য। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল যে সেই অজানা অন্ধকার জলরাশির মধ্যে একটি বাতিঘর দীপ্তি দিতেছে। অর্থাৎ সংশয়ের অন্ধকারের মধ্যেই স্থির প্রত্যয় ধ্রুবদীপ্তিতে জ্বলিতেছে। এখন হইতে আর কোন ব্যক্তি বা মত পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, হৃদ্‌স্থিত সহজ জ্ঞানই তাহাদিগকে অসীম অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলোকে লইয়া যাইবে।

পুরোহিতের আকস্মিক অন্তর্ধান সম্বন্ধে অন্ধদের কথায় বার্ত্তায় একটি কথা বেশ স্পষ্ট হইল যে পুরোহিত যতই নবলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তাঁহার প্রচলিত ধর্ম্মকে সুসঙ্গত করিতে অসমর্থ হইতেছিলেন, ততই মানুষের হৃদয়ের উপর অধিকার বিস্তার করিবার দিকে তাঁহার আগ্রহাতিশয্য লক্ষিত হইতেছিল। পুরুষের অপেক্ষা এইজন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহাপে অধিক অনুসরণ করিত। এই একটি ইঙ্গিতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে মেটারলিঙ্ক কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের উপর যে ধর্ম্মের প্রধান নির্ভর সেই ধর্ম্মকে কতই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বস্তুত এ যুগে যে ধর্ম্মের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এমন প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে, তাহার প্রধান কারণই এই যে মানুষের ধর্ম্মবোধের ও নূতন লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সৌসামঞ্জস্য হইতেছে না—জ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ধর্ম্ম-